এরশাদের শাসনামল : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

গবেষক
মোঃ আবদুল আউয়াল
এম. ফিল.
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

Dhaka University Library
400827

400827

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - ২০০২ইং

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়

পিতা

,

মাতাকে

400827

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

প্রত্যয়ণ করা যাচ্ছে যে, মোঃ আবদুল আউয়াল কর্তৃক "এরশাদের শাসনামল : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ " শীর্ষক এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে । এ শিরোনামের উপর অভিসন্দর্ভ কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয়নি । গবেষণার কাজ সন্তোষজনক ।

29.8.02

অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক
ও
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

400827

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, " এরশাদের শাসনামল : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ " শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম । আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি । এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর বা প্রকাশনার জন্যে আমি উপস্থাপন করিনি ।

তারিখ ২৭.০৮.০২
ঢাকা ।

মোঃ আবদুল আউয়াল
এম. ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি তাঁদের যারা আমাকে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করবার জন্যে সুযোগ করে দিয়েছেন । " এরশাদের শাসনামল : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ " শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলামের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি । রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন ও শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অকৃপণভাবে সময় দিয়েছেন । এবং তাঁর সহধর্মিনী মিসেস ফিরোজা ইসলাম এ গবেষণার ব্যাপারে আমাকে যে স্নেহার্দ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ ।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান, অধ্যাপক এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. এম. মোস্তফা চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. আফতাব আহমাদ সহ আরো অনেকের প্রতি যারা বিভিন্ন সময়ে থিসি্স রচনায় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন । আমার অভিসন্দর্ভের ড্রাফট পড়ে মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ করার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, সিলেট, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর সম্মানিত শিক্ষকগণের সাথে বিভিন্ন অধ্যায়গুলোর তথ্যাদি নিয়ে মত বিনিময় করেছি , তাদের কাছেও ঋণী ।

তা ছাড়াও পিএইচ. ডি. গবেষক অরুণ কুমার গোস্বামী, ঢাকা জেলা জজ কোর্ট এবং বাংলাদেশ হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হারুনুর রশিদ, মো: ওয়াহিদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস,

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম ও মোস্তাক আহমদ আমার বন্ধু সমতুল্য এম.ফিল, পিএইচ.ডি গবেষকদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ ।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ সচিবালয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি, এসকল লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ । অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার থিসিসটি কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ মাইনউদ্দিনকে ধন্যবাদ জানাই ।

আমি এ গবেষণাকর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলাম আমার প্রয়াত পিতা আবদুর রশিদ মাতব্বরের কাছ থেকে । আমার মাতা বেগম রশিদ, ভগ্নি মিনারা বেগম, রাহিমা বেগম, হাসিনা রুমি ও ভ্রাতা আবদুল মমিন, আমিনুল ইসলাম, আবদুল মালেক, ভগ্নিপতি মোতালেব মিয়া ও জসিমউদ্দীন শরীফ তাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি ।

নানাবিধ সমস্যা, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকুলতার মাঝে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে আমাকে যারা উৎসাহিত করেছেন সকলের প্রতিও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ ।

তারিখ ২৭.০৮.০২

ঢাকা ।

মোঃ আবদুল আউয়াল
এম.ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
সারসংক্ষেপ ঃ		I-VI
প্রথম অধ্যায় ঃ	বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	১- ৩১
১.১	পূর্ব কথা	১- ৫
১.২	ভূমিকা	৬- ৯
১.৩	পাকিস্তানী শাসন ঃ ১৯৪৭-'৭১	১০-২১
১.৪	বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ ১৯৭২-'৮২	২২-৩১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পটভূমি ও কৌশল	৩২-৪৫
২.১	সামরিক শাসন '৮২	৩৪-৪০
২.২	আইন-শৃংখলা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনের প্রতিশ্রুতি	৪১-৪৫
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া	৪৬-৮৫
৩.১	গণভোট '৮৫	৪৭-৪৯
৩.২	উপজেলা নির্বাচন '৮৫	৫০-৫৭
৩.৩	জাতীয় পার্টির জন্ম ও এরশাদের রাজনীতিতে আগমন	৫৮-৬২
৩.৪	তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৬	৬৩-৬৭
৩.৫	প্রেসিডেন্ট নির্বাচন '৮৬	৬৮-৭২
৩.৬	চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৮	৭৩-৭৬
৩.৭	সংবিধান সংশোধনীসমূহ	৭৭-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	জেনারেল এরশাদের শাসনামল	৮৬-১০৭
	৪.১	সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা	৮৭- ৯০
	৪.২	তিন জোটের রূপরেখা ও '৯০ গণঅভ্যুত্থান	৯১- ৯৮
	৪.৩	এরশাদ সরকারের পতন	৯৯-১০৭
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	জেনারেল এরশাদের শাসন কাল ঃ পর্যালোচনা	১০৮-১৩২
	৫.১	সংসদীয় কার্যক্রম ঃ ১৯৮৬-'৯০	১০৯-১১৮
	৫.২	ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ	১১৯-১২২
	৫.৩	অর্থনৈতিক গতিধারা	১২৩-১৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	উপসংহার	১৩৩-১৩৫
গ্রন্থপঞ্জী	ঃ		১৩৬-১৪৯
পরিশিষ্ট	-	১. জেনারেল এরশাদের সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্র	১৫০-১৫১
পরিশিষ্ট	-	২. এরশাদ সরকারের গোপনীয় পত্রাদি	১৫২-১৫৩
পরিশিষ্ট	-	৩. গণঅভ্যুত্থানের বুলেটিন	১৫৪
পরিশিষ্ট	-	৪. নেতাদের ভাষণ	১৫৫-১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন গণতন্ত্র । এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে লাখ বাঙালি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং অকাতরে জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম ও গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয় । ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশে একটি সংসদীয় সরকার ছিলো । কিন্তু কিছু দিন পরই সংসদীয় সরকারের সমাধি রচিত হয় । জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় । আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে । এ শাসন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত চালু ছিলো ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন । তার পরই মোস্তাক আহমদ ক্ষমতায় আসীন হলো । এর পর ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হন । তিনি এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুৎত্থানে ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হলে বিচারপতি আবদুস সাত্তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন । অতঃপর জেনারেল এরশাদ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে অপসারণ করে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন । জেনারেল এরশাদ সরকার নয় বছর ক্ষমতায় ছিলেন । গণআন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তাঁর শাসনামলের অবসান ঘটে ।

Dhaka University Institutional Repository

এই পটভূমিতে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায় ; বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হয় , সামরিক বাহিনী কেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে তার ধারণা দেয়া হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ; জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পটভূমি ও কৌশলের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে । এরশাদ সরকারের সামরিক শাসন ও আইন-শৃংখলা এবং দুর্নীতির সার-সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় ; জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়াগুলো উথাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে গণভোট, উপজেলা নির্বাচন, রাজনীতিতে আগমন, সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

চতুর্থ অধ্যায় ; জেনারেল এরশাদের শাসনামলের সমস্যা ও সংকটের সার্বিক পরিস্থিতি আলোকপাত করা হয়েছে, উক্ত সময় সরকার বিরোধী আন্দোলন, তিন জোটের রূপরেখা, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং এরশাদ সরকারের পতনের মূল কারণ উদঘাটন করা হয়েছে ।

পঞ্চম অধ্যায় ; জেনারেল এরশাদের শাসনকালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে । সংসদীয় কার্যক্রম, ১৯৮৬ থেকে '৯০ সাল পর্যালোচনা, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ; জেনারেল এরশাদ শাসনামলের সার্বিক মূল্যায়ন করে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। জেনারেল এরশাদ কিভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং দীর্ঘ নয় বছর ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিলেন এ সম্পর্কে সামগ্রীক আলোকপাত করা হয়েছে ।

শেষ অধ্যায় ; অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে উপসংহার এবং সকল বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ভিত্তিক মন্তব্য করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার লক্ষ্য

জেনারেল এরশাদ সুদীর্ঘ নয় বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিলেন । তাঁর শাসনামল সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে সীমিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে । কি ভাবে এবং কি অবস্থার প্রেক্ষিতে সামরিক আইন জারি হলো ? আর কিভাবে এরশাদের স্বৈরশাসন সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী বাংলাদেশে অব্যাহত থাকল ? এ সব প্রশ্নের আলোচনা, পর্যালোচনা, বিচার বিশ্লেষণ এবং তথ্য উদঘাটন করাই হলো বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ।

গবেষণার উদ্ধৃত সমস্যার বিবরণের আলোকে এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

১. জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ;

২. ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জেনারেল এরশাদ কর্তৃক অনুসৃত কৌশল; এবং

৩. জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা ।

৪. অবশেষে এরশাদ সরকারের পতন ও জনতার বিজয় ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার গুরুত্ব

বাংলাদেশ এবং বিদেশে এরশাদের শাসনামলের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর কতিপয় গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও এগুলোতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ দৃষ্টিকোন থেকে কিছু বিষয় নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে । Talukder Moniruzzaman, Politics and Security of Bangladesh, 1994. Emajuddin Ahmed, Military rule and myth of Democracy, 1988. Lawrence Zirin, Bangladesh from Mujib to Ershid and Interpretive study, 1992. এবং Muhammad A. Hakim, Bangladesh politics. The Shahabuddin Interregnum, 1993. এদের মধ্যে দু' একটি গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনামূলক আলোচনা থাকলেও এরশাদ শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের বিষয়টির উপর কোনটিতেই বিশ্লেষণের স্থান লাভ করেনি । বেশীরভাগ গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলো মূলত লেখকদের নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত এবং এসকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ বর্ণনামূলক আলেখ্য চিত্র । কিন্তু বাংলাদেশে কেন সামরিক শাসন ও স্বৈরশাসনের আবির্ভাব ঘটে ? এ বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবনের তথ্য ও বিশ্লেষণমূলক অনুশীলনের প্রয়োজন । অতএব বর্তমান এ গবেষণা কাজে আলোচ্য বিষয়ে গভীর ও পুংখানুপুংখভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে । গবেষণার সময়কাল নির্ধারণ হয়েছে জেনারেল এরশাদের শাসনামল অর্থাৎ ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান এবং এরশাদ সরকারের পতন ও ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত এ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু এরশাদের শাসনামল নির্ধারিত হয়েছে । তা-ই গবেষণার মাধ্যমে এরশাদ শাসনামলের বহু অজানা অধ্যায় রয়েছে যা কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধে আলোচনা হয়নি । আলোচ্য গবেষণায় এরশাদের শাসনামল ঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ, সামরিক অভ্যুত্থান, ক্ষমতা দখল এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস ইত্যাদি বিষয়ের উপর এক গভীর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে । এর সঙ্গে পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার উপরও আলোচনা করার পরিকল্পনাও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার জন্য প্রাথমিক (Primary) এবং মাধ্যমিক (Secondary) উভয় উৎস থেকেই তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ।

প্রাথমিক; গবেষণায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিলপত্র হলো এরশাদ সরকারের গোপনীয় পত্রাদী, সামরিক আইন জারি ঘোষণাপত্র, বিভিন্ন অধ্যাদেশ, সরকারী গেজেট, দলের গঠনতন্ত্র, নির্বাচনী মেনিফেস্টো, বিভিন্ন প্রচারপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধন, নির্বাচনী তফসীল, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, দেশ-বিদেশী সাময়িকী ও প্রামাণ্য প্রকাশিত পুস্তকসমূহ গবেষণা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস ব্যবহার করা হয় । এবং গণ-আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলো এমন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

মাধ্যমিক; প্রকাশিত পুস্তক, প্রবন্ধ এবং জার্নাল থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার কাজ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের শাসনামলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । এছাড়াও তার শাসনামলের বৈশিষ্ট্যাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিল-পত্রের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১.১ পূর্বকথা

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন-আমেরিকার দিকে তাকালে পরিদৃষ্ট হয় যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত বৈষম্য ও সমস্যা । এগুলো স্বাধীনতার সুফল ভোগের অন্তরায় । বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি দেশ। এখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতার লোভ আর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার কূট-কৌশল রাজনীতিকে কলুষিত করেছে এবং স্বেচ্ছাচারি শাসকগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লিপ্সায় নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা, অত্যাচার ও নির্যাতন করে ক্ষমতায় থাকার অপপ্রয়াস চালিয়েছে । পরিশেষে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের মাধ্যমে জনতার বিজয় হয়েছে ।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তির আক্রমণে এ বঙ্গ পরাধীন হয়েছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সূর্য প্রায় দু'শ বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে যায় । ভারতীয় উপমহাদেশে এক নতুন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের গোড়া পত্তন হয় । বাংলা ছিলো সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশ । এ বঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ আর প্রাচুর্যের অভাব ছিলো না । সম্পদের লোভে পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজ রূপসী বাংলাকে দখল করে নিয়েছিলো ।[১]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি প্রায় দু'শত বছর শাসন, শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত নামের দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হলো । লাহোর প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হলেও পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী তা ভুলে গিয়ে বাংলাকে কলোনি হিসেবে শাসন-শোষণ করতে থাকে । তাঁরা সর্ব প্রথম ভাষার উপর আঘাত হানে । অতঃপর ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করেন । জনতার রোষাণল ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন হয় । জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আসে ।[২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও পাকিস্তান শাসকবর্গ ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি ।[৩] অবশেষে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রামের পর দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত আর ৩০ লক্ষ জীবনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে ।

" ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত ১৯ বছরে মূলতঃ চারবার সামরিক শাসন জারি হয়েছে । প্রথমবার ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট, দ্বিতীয়বার ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর, তৃতীয়বার ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এবং চতুর্থবার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ " ।[৪]

Sentence making is wrong

রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দুর্বলতা, নৈতিক অবক্ষয়, সীমাহীন দুর্নীতি এবং মারাত্মক অস্থিতিশীলতার জন্যই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে । তাঁদের ক্ষমতার বৈধতা আনয়নের জন্য ক্ষমতায় এসে তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে । কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয় । এ প্রসঙ্গে একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে । তাঁর মতে,

> "Most military dictators will continue to 'pay respect to democracy' by organizing rigged elections and plebiscites."[৫]

সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এ হস্তক্ষেপের ফলে দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবোন্নয়নকে তরান্বিত করে ।[৬]

সেনাবাহিনীর মতে, জাতির সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে সামরিক বাহিনী নীরব ভূমিকা পালন করতে পারেনা বলে দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষমতা দখল করে । সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দেন যে, দেশের প্রয়োজনে এসেছি প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ক্ষমতায় থাকব না । তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, ন্যায় বিচার, স্থিতিশীলতা এবং গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবে বললেও পরবর্তীতে দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক বাহিনী বেসামরিকী পোষাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ।[৭] সম্প্রতিকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, সামরিক শাসন বেসামরিক শাসন অপেক্ষা তেমন ভাল কিছু করতে পারেনি । রাজনৈতিক উন্নয়ন সামরিক শাসনের মাধ্যমে কিছুটা নিশ্চিত হলেও সম্পূর্ণ সম্ভব নয় ।

এক হিসেবে দেখা যায় যে, বিশ্বে ১৯৬২ সালে ১৩টি দেশে সামরিক সরকার ছিল, তা ১৯৭৫ সালে এসে দাড়ায় ৩৮টিতে। বাংলাদেশে সামরিক শাসন শুরু হয় ১৯৭৫ সালে ।[৮] ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক জুনিয়র অফিসার কর্তৃক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় । এ অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন ।[৯]

শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন । তিনি জেনারেল কে.এম. সফিউল্লাহকে চীফ অব স্টাফের পদ থেকে সরিয়ে অদস্থলে জিয়াউর রহমানকে নিযুক্ত করেন । ৩ নভেম্বর বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় । এ অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান গৃহবন্দী হন এবং খালেদ মোশাররফ সেনা প্রধান হন । ৫ নভেম্বর খোন্দকার মোশতাক আহমদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস. এম. সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয় । ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান হন ।[১০] পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে ২১ এপ্রিল বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন । এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন । তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির কিছুটা পরিবর্তন করে পঞ্চম সংশোধনী বিল পাশ করেন, এবং সামরিক শাসনকে বেসামরীকরণের জন্যে উদ্যোগ হিসেবে রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন । সারা দেশের সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় । তখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করলেও সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষের কারণে তা সফলতা অর্জন করেনি ।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন । ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাত হীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পদচ্যুত করেন নির্বাচিত রাষ্টপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে । তিনি দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি এবং সংবিধান স্থগিত করেন । বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে নামে মাত্র রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন । বাংলাদেশে এ অভ্যুত্থান প্রথম নয় কিন্তু অভ্যুত্থানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত । এটি সুপরিকল্পিত সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করা হয় । তা ছাড়া এ অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থ যতটুকু জড়িত ছিল, তাঁর অনেকগুণ বেশী ছিল জেনারেল এরশাদের উচ্চাভিলাষ ।[১১]

তিনি সামরিক শাসন জারি, সংবিধান স্থগিত এবং নির্বাচিত সংসদ বাতিল করে নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন । ক্ষমতা দখল সম্পর্কে জেনারেল এরশাদ বলে ছিলেন,

> "We will stay in power for about two years and then hand over power to a political party but obviously not to Awami League as Awami League will destory the Armed Forces."[১২]

তাঁর এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা ও সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে একটা কৌশল ছিলো । পরবর্তীতে তিনি দু'বছরের পরিবর্তে নয় বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৯৯০ এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন । এ অভ্যুত্থানের রূপকার সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, তিন রাজনৈতিক জোট, পেশাজীবি সমিতি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ।[১৩] এ ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে জেনারেল এরশাদ সরকার ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মোহাম্মদ আবুল কাসেম, তুলনামূলক রাজনীতি, ডায়মণ্ড কর্ণার, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৭৪, ২৭৯

২. ফেরদৌস হোসেন, রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, ১ম সংখ্যা, জুন - ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৫৫, ৬৪

৩. মোঃ মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭ - ৭১, সমর প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২২৫

৪. হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকী করণ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.৬

৫. Talukdar Maniruzzaman, "*Military Dictators Ships*" *Encyclopedia of Government and Politics,* Vol. 1, 1992, p. 260.

৬. M. Mizanur Rahman Sikder, " *Military in Bangladesh : A case study of Ershad regime*," (Ph.d.Thesis) D.U, December 1997, p. 15.

৭. হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৮- ৯ ।

৮. আমীর খসরু, উদার গণতন্ত্রের কথা, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১ জানুয়ারি, ২০০০ ।

৯. M. Nazrul Islam, "*Parliamentary Democracy in Bangladesh An Assessment*" *Perspectives in Social Science,* Vol. 5, University of Dhaka, October 1998, p. 57.

১০. Emajuddin Ahamed, *Military Rule and the Myth of Democracy*, University Press Ltd. Dhaka, 1988, pp. 71, 79-80

১১. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, শেখ মো. ইসমাইল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত,ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৬-৫৭ ।

১২. মোহাম্মদ সোলায়মান, "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট ঃ এরশাদের শাসন কাল," রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯১, পৃ. ২৮-২৯

১৩. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

১.২ ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র । স্বাধীনতার পর সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়নি । স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে এ দেশে বহুবার সামরিক শাসন এসেছে আবার বেসামরিক পোষাকে স্বৈরশাসনের আবির্ভাব ঘটেছে ।[১]

স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশে দীর্ঘকাল সামরিক শাসন ছিলো । এদেশে সামরিক শাসনের জন্ম হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট । এ অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয় । বাংলাদেশ স্বাধীনের পর এটা ছিলো প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান । পাকিস্তান শাসন আমলেও ২৩ বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছিলো । পাকিস্তানী আমলের ন্যায় বাংলাদেশও স্বাধীনতার পর বিগত ১৯ বছরের বেশীরভাগ সময় সামরিক বাহিনী রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছে ।[২]

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায় । ৭ নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সেনাপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান । তিনি নিজের শাসনকে জেনারেল আইয়ুব খানের মত নির্বাচন দ্বারা বেসামরিক রূপ দেন । জেনারেল জিয়া ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলে তাঁর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর এর নির্বাচনে জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।[৩] জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি

Dhaka University Institutional Repository

সাত্তার কিছু দিন ক্ষমতায় ছিলেন । এরপর বিচারপতি সাত্তারকে রাজনৈতিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক ও আইন-শৃংখলার অবনতির অজুহাতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান লে. জে. এইচ.এম. এরশাদ এক রক্তপাত হীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন । ফলে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন । জেনারেল এরশাদ সংবিধানকে স্থগিত এবং নির্বাচিত সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন । ২৭ মার্চ বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয় ।[৪]

সামরিক শাসন জারি করার পর জেনারেল এরশাদ একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন । এ উপদেষ্টা পরিষদ বাতিল করে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন । অর্থাৎ সামরিকী আবরণে বেসামরিকী করণের প্রয়াস চালান । জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্টের পদটি দখল করেন । বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী বিনা প্রতিবাদে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন ।[৫]

ক্ষমতা দখলের পর এরশাদ বাংলাদেশে যত ধরনের বেসামরিক প্রতিষ্ঠান ছিলো তা হিসেব করে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন । ঐ সব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় ছিলোনা সবেমাত্র গড়ে উঠেছিলো । এসব ধ্বংস করার কারণ ছিলো সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিতে সর্বক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ আমলা আধিপত্য বিস্তার । ''শুধু তাই নয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দু'ধরনের আমলা থাকবে । উর্ধতন সামরিক আমলা, অধস্তন বেসামরিক আমলা এ লক্ষ্য অর্জনে গত এক দশক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তিনি কাজ করে গেছেন এবং ঐ সব কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেছে ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের পটভূমি ।''[৬]

গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরশাসকের পতন ঘটেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, উল্লেখ্য ১৯৪৮ সালে তুরস্কে, ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ভেনুজুয়েলা ও কলম্বিয়ায়, ১৯৬৫ সালে সুদান ও ইরাকে এবং ১৯৭৩ সালে থাইল্যাণ্ডে ইতিহাসে এ অধিকার আদায়ের মহান সংগ্রাম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খাঁনের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে উঠলে ২৫ মার্চ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ।[৮] আর ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী জনতার বিজয় সূচিত হয়েছে ।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তাঁর সরকার বেসামরিকীকরণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে । কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বের অভাব ও রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় নাগরিকদের মধ্যে বিরূপ ধারণা পরিগ্রহ হয় । ফলে ১৯৮৩ সালে এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটে । আর এ গণআন্দোলন ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর থেকে গণবিস্ফোরণে পরিণত হয় । পরবর্তীতে তা গণঅভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয় ।[৯]

১৯৯০ এর অভ্যুত্থানে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, পেশাজীবী সমিতি, বি.এন.পি. আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং পাঁচ দলীয় বামপন্থী জোটের আন্দোলন গণঅভূত্থানে রূপ নিলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন ।[১০] আন্দোলনরত সকল জোট প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ-এর নাম রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রস্তাব করলে তিনি রাজি হন। অবশেষে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ বিকেলে বঙ্গ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জেনারেল এরশাদ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ।[১১] ফলে স্বৈরশাসনের পতন হয় এবং গণতন্ত্র রাহু গ্রাস থেকে মুক্তি লাভ করে । সংগ্রামী জনতার অভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ সরকারের দীর্ঘ নয় বছর শাসনের অবসান ঘটে ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration*, Oxford University Press, U.S.A. 1973, p. 203.

২. হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১,পৃ. ৫ ।

৩. ফেরদৌস হোসেন, রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৯১, পৃ. ৬৪ ।

৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮০ ।

৫. The Bangladesh Times (English Daily News paper), Dhaka, 12 December 1983, p.1

৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নব্বুই এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. .

৭. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১.

৮. Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, University Press Ltd, Dhaka, 1988, p.26.

৯. মোহাম্মদ সোলায়মান, "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট ঃ এরশাদের শাসনকাল," রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ২৫ ।

১০. M. Nazrul Islam, "*Parliamentary Democracy in Bangladesh An Assessment*", *Perspectives in Social Science*, Vol. 5, University of Dhaka, October 1998, p. 59.

১১. আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, '৭০ থেকে ৯০ (বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট), পাণ্ডুলিপি ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ পাকিস্তানী শাসন ঃ ১৯৪৭-'৭১

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির প্রায় দু'শত বছর শাসন-শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে দ্বি-জাতিত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সমন্বয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হলো ।[১]

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন করেন । লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনার কথা থাকলেও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি । পূর্ব পাকিস্তান সর্বদা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার এবং ন্যায় সঙ্গত অধিকার থেকে অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত হতে থাকে ।[২]

লাহোর প্রস্তাবে একাধিক মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ (States) গঠনের কথা বলা হয় । কিন্তু ১৯৪৬ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মূল লাহোর প্রস্তাবে State কথাটি ব্যবহার করেন এবং একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন ।[৩]

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয় । এ আইনে সর্বভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের কথা বলা হয় । কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিলো ব্রিটিশ উপনিবেশের কাঠামো অনুসারে প্রণীত । এ আইনের সপ্তম তফসীলে পাকিস্তানে স্বাধিকার ভিত্তিক কোন প্রদেশ গঠনের পর্যাপ্ত বিধান রাখা হয়নি।[৪] ফলে বড় ধরনের রাজনৈতিক বিরোধের সৃষ্টি হয় ।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-(ক) ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করে এবং ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় ।[৫] এ হস্তক্ষেপে পূর্ব বাংলার নেতৃবর্গের শাসন পরিচালনার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান নামক যে, রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তা দু'অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের অসমচরিত্র এবং আমলা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণহীনতার ফলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় । ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু ছিলো । কিন্তু অংকুরেই তা শেষ হয়ে যায় । এর কিছু দিন পরই সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয় ।[৬]

১৯৪৭ সালে যখন মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠে, তখন পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ নুতন পথের দিগন্ত খুঁজে পায় । তাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ।[৭] এবং আশা করেছিল নতুন রাষ্ট্র এ দেশের মানুষের মুক্তি - কল্যাণের পথ উম্মুক্ত করবে । কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প দিনের মধ্যে আশা-আকাংখা ভেঙ্গে যায় । পাকিস্তানী শাসকবর্গ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য লাভের চেষ্টা চালায় ।

প্রথমেই পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর সাথে ভাষাগত বিরোধ সৃষ্টি হয় । ১৯৪৮ সালে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঘোষণা করেন, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা" (Urdu and only Urdu shall be the state Language of Pakistan) তাৎক্ষণিক বাংলার ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটায় । আন্দোলনের ব্যাপক গণসমর্থন বুঝতে পেরে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণেতাগণ বাংলাভাষাকে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হন । অবশেষে ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে ।[৮] এ ভাষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ ধারণ করে । পরবর্তীতে পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান একটি আলাদা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে ভাষা আন্দোলনের অবদান রয়েছে ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ রূপ ধারণ করে । এ ভাষা ভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায় ।[৯]

১৯৫১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু ষড়যন্ত্রের কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি । পরবর্তীতে শাসকবর্গ গণ-দাবির চাপে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়ে ছিলো । ১৯৫৪ সালের নির্বাচন কৌশলগত কারণে এ. কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর নেতৃত্বে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয় । এসময়ে বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাওলানা ভাসানী একটি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন । ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই পরিচালিত হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচন । ২১ দফা কর্মসূচীতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা বলা হয় । শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা ন্যাস্ত থাকবে । অন্যান্য বিষয় পূর্বাঞ্চলের হাতে ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয় ।[১০]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' নির্বাচনী প্রচারণায় ভোটারদের ধারণা দিতে সমর্থ হয় যে, মুসলিমলীগ গণ-বিরোধী, দুর্নীতি পরায়ন এবং পাকিস্তানকে ধ্বংসের মুখে পর্যবসিত করেছে । পূর্ব বাংলার খ্যাতিমান রাজনীতিক নেতা মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করেন । 'যুক্তফ্রন্ট' নৌকা প্রতীক নিয়ে ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে । 'যুক্তফ্রন্টের' প্রচার অভিযান ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত । কিন্তু 'যুক্তফ্রন্ট' যে একটি শক্তিশালী নির্বাচনী জোট মুসলিম লীগ তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি । এ নির্বাচনে জনগণের আন্তরিকতার কারণে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো । এ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯ টি এর মধ্যে 'যুক্তফ্রন্ট' ২২৩ টি আসনে জয়লাভ করে । আর মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পেয়েছিলো । পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে মুসলিম আসন সংখ্যা ২৩৭ এবং অমুসলিম আসন সংখ্যা ছিলো ৭২টি । ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয় লাভ করলেও অভ্যন্তরীন উপদলীয় কোন্দলে 'যুক্তফ্রন্ট' রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হলো না ।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগের বিরোধিতার জন্যে এ জোট গড়ে উঠেছিলো । ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতাদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয় ফলে 'যুক্তফ্রন্ট' বিভক্ত হয়ে পড়ে ।[১২] এ নির্বাচনে বিজয় লাভ করেও মুসলিম লীগের চক্রান্তের কারণে 'যুক্তফ্রন্ট' ক্ষমতায় বেশি দিন অধিষ্ঠিত হতে পারেনি ।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অসারতা প্রমাণিত হয় । বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যয় নিয়ে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি হয়েছিলো ।[১৩] যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটায় ।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাংখা পরিস্ফুট হয়নি বরং দু'বছরের মাথায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করে সংবিধান বাতিল করেন ।[১৪]

জেনারেল আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন । অতঃপর আইয়ুব খান সরকার ১৯৬২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করেন । যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি । এ বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা পেশ করেন । কিন্তু আইয়ুব খান সরকার এর পরই ' আগরতলা ষড়যন্ত্র ' মামলায় পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজনকে জেলে বন্দী করে ।[১৫] ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় । ছাত্র সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টায় ১১ দফা সম্বলিত একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় যা পূর্ব পাকিস্তানের সকল পেশাজীবী ও গোষ্ঠীর স্বার্থকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলো ।[১৬] এ ১১ দফা কর্মসূচির গণরোষেই জেনারেল আইয়ুব খান সরকারের পতন তরান্বিত করে ।

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে ৬ দফা প্রণয়নের ফলে সরকার আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে । অন্যদিকে ৬ দফার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে উজ্জীবিত করে ।[১৭]

১৯৬৮ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান সরকার বিরোধী গণআন্দোলন দেখা দিলে তিনি এ আন্দোলন নশ্বর করার জন্যে চেষ্টা চালান । ৭ ডিসেম্বর ঢাকাতে দু'জনকে গুলি করে হত্যা করা হয় । কিন্তু তা-তে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ ধারণ করে ।[১৮] এ গণঅভ্যুত্থানই জেনারেল আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয় । ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল আইয়ুব খানের পতন ঘটে ।[১৯] তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন । তাঁর নির্দেশে ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি হয় ।[২০] ইয়াহিয়া খান ২৮ নভেম্বর ঘোষণা দেন যে, ১৯৭০ সালে অক্টোবর মাসে জাতীয় গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।[২১] পরে পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৯ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নিবাচন অনুষ্ঠিত হয় । প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রথম পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ।[২২] এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬ দফা এবং ১১ দফার ভিত্তিতে প্রচারকার্য চালিয়ে যায় ।[২৩] তাঁরা প্রচারের মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরে ।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন সমাপ্তির পর হতে ১৯৪৭-'৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসকবর্গ বিভিন্নভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন-শোষণ করতে থাকে । তাঁরা বড় রকমের অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয় । এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের মোট আঞ্চলিক আয় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি অর্জন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠে এবং উন্নতি সাধিত হয় । পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হলো পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাঁচামালের যোগানদাতা । অর্থমন্ত্রী আঃ কাদিরের বক্তব্য থেকে এ অর্থনৈতিক বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে । তিনি বলেন, " There has been some disparity in the field of Economic development between the to proviences."[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১

অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ঃ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়ন ব্যয়

সময়	উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয়		পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়	মোট উন্নয়ন ব্যয়		পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের % হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যয়		
	মোট ১	সরকারী ২	বেসরকারী ৩	পূর্ত ৪	কর্মসূচি ৫	৬	৭	৮
পূর্ব পাকিস্তান								
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫	১,০০০	৭০০	৩০০	-	-	১,০০০	২,৭১০	২০%
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯-৬০	২,৭০০	১,৯৭০	৭৩০	-	-	২,৭০০	৫,২৪০	২৬%
১৯৬০/৬১-১৯৬৪-৬৫	৯,২৫০	২৫০	৩,০০০	-	৪৫০	৯,৭০০	১০,০৪০	৩২%
১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯-৭০	১৬,৫৬০	১১,০৬০	৫,৫০০	-	-	১৬,৫৬০	২১,৪১০	৩৬%
পশ্চিম পাকিস্তান			সিন্ধু অববাহিকা পূর্ত কর্মসূচি					
১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫	৪,০০০	২,০০০	২০০	-	-	৪,০০০	১১,২৯০	৮০%
১৯৫৫/৫৬-১৯৫৯-৬০	৭,৫০০	৪,৬৪০	২,৯৩০	-	-	৭,৫৭০	১৬,৫৫০	৭৪%
৯৬০/৬১-১৯৬৪-৬৫	১৮,৪০০	৭,৭০০	১০,৭০০	২,১১০	২০০	২০,৭১০	৩৩,৫৫০	৬৮%
৯৬৫/৬৬-১৯৬৯-৭০	২৬,১০০	১০,১০০	১৬,০০০	৩,৬০০	-	২৯,৭৭০	৫১,৯৫০	৬৪%

সূত্র ঃ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপদেষ্টা প্যানেলের প্রতিবেদন, ১ম খণ্ড, পরিকল্পনা কমিশন, পাকিস্তান সরকার, জুলাই ১৯৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২

বৈদেশিক সাহায্যের মোট প্রবাহ

মোট (মিলিয়ন টাকা)	পূর্ব পাকিস্তান (মিলিয়ন টাকা)	পশ্চিম পাকিস্তান (মিলিয়ন টাকা)
দ্বিতীয় পরিকল্পনা ২,৫৮২ ৪ বছর (১৯৬১-৬৫)	৭৬৭	১০,২৫৫
তৃতীয় পরিকল্পনা ৪,৪৮১ (১৯৬৫-৭০)	৬,৯০৪	১১,৩৮৫

সূত্র ঃ মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্ত শাসন থেকে স্বাধীনতা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে দু'অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয় । পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বী কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত । এ জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেনি । ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে জনগণের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলো ।[২৫] ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয় অর্জন আর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসনে জয়লাভ করে ।[২৬] এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসনে জয় হয় । এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে ।[২৭]

সারণী - ৩

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের চিত্র

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন

দলের নাম / প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল								মোট মহিলাসহ
		পূর্ব পাক	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প. সী.প্র.	বেলুচিস্থান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	-	-	-	-	-	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	-	৬৪	১৮	১	-	-	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	-	১	১	৭	-	-	-	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	-	৭	-	-	-	-	-	৭
জামায়াত-উল উলামায়ে ইসলাম	৯৩	-	-	-	৬	১	-	-	৭
মারকায-ই-জামায়াত উল-উলামায়ে ইসলাম	-	-	৪	৩	-	-	-	-	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬১	-	-	-	৩	৩	-	১	৭
জামায়াতে ইসলাম	২০০	-	১	২	১	-	-	-	৪
মুসলিম লীগ(কনভেনশন)	১২৪	-	২	-	-	-	-	-	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	-	-	-	-	-	-	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৩০০	১	৩	৩	-	-	৭	-	১৪
মোট		১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

সূত্র ঃ মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-'৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	-	২
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	-	-
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	-	-
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	-	-	-
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	-	-
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	-	১
জামায়াতে ইসলামি	১	-	১
নেজামে ইসলামি	১	-	১
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	-	-	-
মারকাজে আহলে হাদীস	-	-	-
জামাত-ই-উলামায়ে ইসলাম(হাজারী)	-	-	-
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)	-	-	-
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	-	৭
মোট	৩০০	১০	৩০০

সূত্র ঃ মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-'৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের বিজয়ে শাসকগোষ্ঠী শঙ্কিত হয়ে পড়ে । ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন । প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৩ মার্চ সারাদেশে ধর্মঘট পালনের আহ্বান করা হয় । এ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ পল্টনের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করেন । ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয় । ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন "এ বারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ২৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় । ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণ চালায় । সূচনা হয় বাঙালী জাতীর প্রতিরোধের সংগ্রাম ২৫ মার্চ মধ্য রাতের কিছু পরে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন । ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ।[২৮] এ পর্যায়ে অভ্যুদয় হয় স্বাধীন বাংলাদেশের এবং অবসান ঘটে যুক্ত পাকিস্তানের । ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার গঠন করা হয় । শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হন ।[২৯]

১৯৭০ সালের নির্বাচনই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নিয়েছিলো । পরিশেষে একশত নব্বই বছর ব্রিটিশ শাসন আর পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ করে । বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জন ।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. A.K. Chowdhury, *The Independence of East Bengal*, Jatiya Grantha Kendra, Bangladesh, 1984, pp. 88-90.

২. মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-'৪৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২১৭ ।

৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, উপনিবেশের সংস্কৃতি, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৯ ।

৪. মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৭।

৫. Khalid bin Sayeed, *Pakistan the Formative Phase 1857-1948*, Oxford University Press, London, 1968,p. 258

৬. ফেরদৌস হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি, নির্ঝর পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭ ।

৭. Rangalal Sen, *Political Eletes in Bangladesh*, University Press Ltd., Dhaka, April 1986, pp. 65-67.

৮. S.R. Chakravarty Verendra Naraen, *Bangladesh History and Culture*, Vol. 1, South Asian Publishers, New Delhi, 1986, pp. 150-154

৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ২১।

১০. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১ (রাজনৈতিক ইতিহাস- ১ম খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৯-৭০ ।

১১. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emerigence of Bangladesh*, Bangladesh Books International Ltd., Dhaka, 1975, p.33.

১২. Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, University of Dacca, 1980, p.22.

১৩. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাঃ), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬১ ।

১৪. Mostafa Chowdhury, *Pakistan its Politics and Bureaucracy*, Associated Publishing house, Newdelhi, 1988, p. 53.

১৫. মোঃ মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-'৭১, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৫০, ১৭২, ১৮৬, ২০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. লেনিন আজাদ,উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঃ রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫৫

১৭. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, "বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও বাকশাল প্রবর্তনঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ", (পিএইচ.ডি. অভিসন্দভ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ ৫৬ ।

১৮. Sheelendra Kumar Singh and others (Edited), *Bangladesh Documents*, Vol. 1, The University Press Ltd., Dhaka, 1999, p. 2.

১৯. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩১ ।

২০. Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its aftermath*, University Press Ltd., Dhaka, 1988, p. 26.

২১. Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in national integration*, Oxford University Press, U.S.A. ,1973, p. 187.

২২. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ, ইমপ্রেস পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০৫

২৩. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Bangladesh Book International Ltd. Dhaka, 1975, p. 39.

২৪. See The Pakistan Observer, Dacca, 4 May, 1962.

২৫. Sirajul Islam, *History of Bangladesh 1704-1971*, Vol. 1, Political History, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p. 31

২৬. A.K. Chowdhury , *The Independence of East Bengal*, Jatiya Grantha Kendra, Bangladesh, 1984, p. 257.

২৭. Rangalal Sen, *Political Eletes in Bangladesh*, University Prfess Limited, Dhaka, April 1986, p. 263.

২৮. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬-৫৯৭

২৯. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Bangladesh books international Limited, 1975, p. 47.

৩০. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাঃ), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ ১৯৭২-'৮২

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে দু'টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো । পরবর্তীতে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয় । ১০ এপ্রিল মেহেরপুর মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করে ।[১] অবসান হয় পাকিস্তানী শাসনের । ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন এবং দেশের শাসনভার গ্রহণ করে । ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন । তিনি একটি চার্টার্ড বিমানে করে লণ্ডনের হিথরোবিমান বন্দরে পৌছেন । ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব বৃটিশ রয়েল এয়ার ফোর্সের রাজকীয় বিমানে দিল্লী হয়ে ঢাকা অবতরণ করেন । দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি একটি শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারির মাধ্যমে সরকারের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয় । এ আদেশ বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার টাইপের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । উক্ত আদেশের ৫ নং ধারা বলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় । ১২ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তেফা দেন । বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নতুন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন । একই দিবসে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ।[২]

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন আহ্বান করেন ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল । অধিবেশনের প্রথম দিনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাহ আবদুল হামিদ স্পীকার এবং মোহাম্মদ উল্লাহ ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন । অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন গণপরিষদ খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় । এ সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কে কোন প্রস্তাব থাকলে তা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট ১৯৭২ সালের ১৭ মে এর মধ্যে পৌছানোর অনুরোধ করা হয় । বিভিন্ন মহলের প্রস্তাব থেকে ৯৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয় । কমিটি মোট ৪৭ টি অধিবেশনে ৩০০ ঘন্টা আলোচনার পর খসড়া সংবিধান রচনা করে । কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশ করেন ।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় । ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের অধিবেশন মুলতবী হয়ে যায় । ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর হয় । ঐ দিনই গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হলো । এরপর ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয় ।[৪] এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯২ টি আসনে বিজয়ী হয় । অপর ৮টি আসনে জাতীয় লীগের নেতা আতাউর রহমান খান এবং জাসদের আবদুস সাত্তার বিজয়ী হন । আর স্বতন্ত্র প্রার্থী ৬টি আসনে জয়লাভ করে । আওয়ামী লীগের এ নিরঙ্কুশ বিজয়ে বিরোধীদলের অনেক নেতা অভিযোগ করেন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে ।[৫]

অতঃপর ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান সংসদে বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বিল পেশ করেন । তা মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে সংসদে গৃহীত হয় । বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংসদে কোন আলোচনা এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি । এ বিলের মাধ্যমে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে রাষ্ট্রপতির উপর নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত করা হয় । বিলটি পাশ হওয়ার পরই শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় রাষ্ট্রপতি হন । গঠন করেন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) । অবসান ঘটে সংসদীয় গণতন্ত্রের । সৃষ্টি করা হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর । তিনি সেনাবাহিনীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় । দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে ।[৬] এরূপ পরিস্থিতিতে জনগণ, রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর মনে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব বিরাজ করতে থাকে । তখন সেনাবাহিনীর এক ক্ষুদ্রতম অংশ কর্তৃক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন ।

এ সামরিক অভ্যুত্থানের পর শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি করা হয় । তিনি দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং 'বাকশাল' গঠনের আদেশ বাতিল করেন । মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে অপসারন করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয় । ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রিয় কারাগারে বাকশালের চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী ও

Dhaka University Institutional Repository

এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো । এই ৩ নভেম্বরই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করে খালেদ মোশাররফ সেনা বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন এবং তখন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হয় । তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েমের কাছে স্বীয় দায়িত্বভার অর্পণ করেন । সিপাহীরা ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটায় । এ অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ তাঁর সমর্থকসহ নিহত হন । মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পুনরায় সামরিক বাহিনীর প্রধান নিয়োগ হন ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই তারিখে বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে সরকার উৎখাত ও সেনাবাহিনী ধ্বংস করার চেষ্টা চালানোর অভিযোগে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্নেল (অবঃ) তাহেরকে ফাঁসি দেয়া হয় ।[৭]

জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন । ১৯৭৭ সালে ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করতে বাধ্য হন । তিনি একই সঙ্গে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন।[৮] সামরিক সরকার রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে ১৯৭২ সালের গৃহীত সংবিধানের চারটি রাষ্ট্রীয় মূল নীতির কিছুটা পরিবর্তন করে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংযোজন, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা" পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার কথাগুলো প্রতিস্থাপন করা হয় । এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করেন । অতঃপর তিনি ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্যে ১৯৭৭ সালে ৩০ মে গণভোটের তারিখ নির্ধারণ করেন। আসন্ন গণভোটে সেনাবাহিনীর প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা, তা যাচাইয়ের জন্যে 'হ্যাঁ' - 'না' এর দেশব্যাপী গণভোটের আয়োজন করা হয় । মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান উক্ত গণভোটে নির্বাচনী ইস্তেহার হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা দেন । ৩০ মে অনুষ্ঠিত গণভোটে সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৯ ভাগ আস্থাসূচক 'হ্যাঁ' ভোট পড়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অনুকূলে । তিনি প্রথমে ১৯৭৮ সালে 'জাগদল' এবং ১ মে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' গঠন করেন । ৩ জুন রাষ্ট্রপতি

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় । এ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের' পক্ষ থেকে জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী এবং 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের' পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান মনোনয়নপত্র দাখিল করেন । ১৯৭৮ সালের ৩ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান শতকরা ৭৬ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন । এবং জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী শতকরা ২১ ভাগ ভোট পান । রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ফরমান জারির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের প্রবর্তিত একদলীয় শাসন ব্যবস্থা রহিত করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ সুগম করেন । ১৯৭৬ সালের ৩ মে এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উপর বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হয় । পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বি.এন.পি.) রাজনৈতিক দল গঠন করে দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন । বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি দেশে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে । উক্ত নির্বাচনের তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয় । এই নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের মধ্যে বি.এন.পি. ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে । আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি, মুসলিম লীগ ও আই.ডি.এল. (রহিম) ২০টি, জাসদ ৮টি, আওয়ামী লীগ (মিজান) ২টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ২টি, গণফ্রন্ট ২টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ১টি, জাতীয় একতা ১টি, সাম্যবাদী দল ১টি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ১৬টি আসন লাভ করে । নির্বাচনে অংগ গ্রহণকারী মোট দলের সংখ্যা ৩১টি এবং প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২১২৫ জন ।[৯]

এ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৪ ভাগ লাভ করে বি.এন.পি. এবং ২৫ ভাগ লাভ করে আওয়ামী লীগ ।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী - ১

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের চিত্র

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের % হার
বি.এন.পি.	২৯৮	২০৭	৪৪
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯	২৫
মুসলিম লীগ ও আই.ডি.এল.(রহিম)	২৬৫	২০	৮
আওয়ামী লীগ(মিজান)	১৮৩	২	২
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৪০	৮	৬
স্বতন্ত্র	৪২৫	১৬	৯
অন্যান্য দল	৪১৯	৮	৬
মোট	২১২৫	৩০০	১০০

Source : Talukder Maniruzzaman, The Bangladesh Revolution and its Aftermath, The University Prfess Ltd. Dhaka, 1988

১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল তারিখে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী । ৬ এপ্রিল উক্ত সংশোধনী বলবৎ হয় । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফশিলের সংশোধন করে আইন পাশ করা হয় । এ আইনে বলা হয় ঃ

"১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন ফরমান দ্বারা সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হয়েছে তা,এবং অনুরূপ কোন ফরমান,

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন হতে আহরিত বা আহরিত বলে বিবেচিত ক্ষমতা বলে অথবা অনুরূপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে বা অনুরূপ বিবেচনায় কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত বা গৃহীত বলে বিবেচিত আদেশ, কাজ-কর্ম, ব্যবস্থা কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষিত হল, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না " ।[১০]

১৯৭৯ সালের নির্বাচনের সময় দেশে সামরিক আইন বহাল ছিলো ৬ এপ্রিল বলা হলো, জাতীয় স্বার্থে সামরিক আইনের প্রয়োজন নেই তাই সারাদেশ হতে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলো । আরো জানানো হয়, দেশের সার্বিক কল্যাণ ও ভবিষ্যতের স্বার্থে এখন আর সামরিক আইনের দরকার নেই ।[১১]

১৯৭৯ সালের ১৫ এপ্রিল ছিল বাংলা নববর্ষ । এ দিনে জিয়াউর রহমান ৪২ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন । উক্ত মন্ত্রিপরিষদের প্রধানমন্ত্রী হন শাহ্ আজিজুর রহমান ।[১২] পরের দিন ১৬ এপ্রিল 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' চালুর সিদ্ধান্ত হয় ।

১৯৭৯ সালে ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান পূর্বের প্রায় চার বছরের সামরিক শাসনকে বৈধ করেন । তিনি রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কিছুটা সফলতা অর্জন করলেও কিন্তু অভাবের দেশে প্রতিশ্রুতি ও বিনিয়োগের লম্বা অঙ্গীকার সরকারী কার্যক্রমকে দুর্বল ও অনুৎপাদনশীল করে দেয় " অর্থের কোন সমস্যা নেই" এ ধরনের শ্লোগান জেনারেল জিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে । অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষ এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাড়ে পাঁচ বছরে বহু বারের ব্যর্থ অভ্যুত্থান তাঁর ক্ষমতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় । অতঃপর ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের এক সেনা বিদ্রোহে নিহত হন । তখন অভ্যুত্থানকারী দু'ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয় । প্রথমত; এ অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর ঐকমত্য ছিলো না । দ্বিতীয়ত;

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যুত্থান রাজধানীর বাহিরে হওয়ায় তাঁরা ক্ষমতা গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হয় । সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের কারণে এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলো । চট্টগ্রামের সেনাধিনায়ক জেনারেল এম.এ. মনজুর অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে যোগ দেন । কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এ অভ্যুত্থানের পক্ষে সমর্থন দিলেন না । জেনারেল মনজুর তার পরই একটি 'বিপ্লবী পরিষদ' গঠনের ঘোষণা দেন । এ দিকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার ৩ ঘন্টা পরে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারকে জানানো হয় । তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন । জেনারেল মনজুর সেনা বাহিনীর অন্য কোন অংশের সমর্থন না পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন পালিয়ে যাওয়ার । তিনি পালায়নের পথে চট্টগ্রামের খৈয়াপাড়া গ্রেফতার হন । পরে জেনারেল মনজুরকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয় । তাঁরা জেনারেল মনজুরকে গুলি করে হত্যা করে।[১৩]

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার সংবিধানের বিধান অনুসারে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করার ঘোষণা দেন । কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ছিলো না । ১৯৮১ সালের ১ জুলাই তারিখে সংসদে পেশ করা হয় সংবিধান ষষ্ঠ সংশোধনী বিল । ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে পাস হয় সংবিধান ষষ্ঠ সংশোধনী বিল । এ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আইনগতভাবে যোগ্যতা অর্জন করেন । বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১৯৮১ সালের ২৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ১৫ অক্টোবর নির্ধারণ করেন । নির্বাচন কমিশন ৫ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে পুনঃ নির্ধারণ করে ১৫ নভেম্বর । এ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয় । এবং অন্যান্য দলের মনোনীত প্রার্থীরা হলো ড. কামাল হোসেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (হাসিনা), জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী (নাগরিক কমিটি ও জনতা পার্টি), মেজর (অবঃ) এম.এ. জলিল (জাসদ), প্রফেসর মোজাফফর আহমদ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি), এবং মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজী হুজুর (স্বতন্ত্র) প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন । ন্যাশনাল ফ্রন্টসহ ১৬টি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে । ১৯৮১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার অভিযুক্ত ১২ জন সামরিক অফিসারের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তার তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ডঃ কামাল হোসেনের চেয়ে ৮৫,৬৭,৮৪৫ ভোট বেশী পেয়ে বিজয়ী হন । এ নির্বাচনে ডঃ কামাল হোসেন নির্বাচন কমিশনের কাছে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন ।[১৪] উক্ত ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের ৬৫.৫২ শতাংশ লাভ করে বি.এন.পি. মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার এবং আওয়ামী লীগ (হাসিনা) মনোনীত প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন অর্জন করে ২৬ শতাংশ ভোট । অন্যান্য প্রার্থীগণ পর্যাপ্ত ভোট না পাওয়ায় জামানত বাজেয়াপ্ত হয় ।

সারণী - ২

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফলের চিত্র

প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
আবদুস সাত্তার	বি.এন.পি.	১,৪২,০৩,৯৫৮	৬৫.৫২
কামাল হোসেন	আওয়ামী লীগ (হাসিনা)	৫৬,৩৬,১১৩	২৬.০০
মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজজী হুজুর	স্বতন্ত্র	৩,৮৮,৭৪১	১.৮০
এম.এ.জি. ওসমানী	নাগরিক কমিটি ও জনতা পার্টি	২,৯৩,৬৩৭	১.৩৫
মেজর (অবঃ) এম.এ.জলিল	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ)	২,৪৮,৭৬৯	১.১৪
প্রফেসর মোজাফফর আহমদ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২,২৪,১৮৮	১.০৩
মোহাম্মদ তোহা	সাম্যবাদী দল	৩৭,১৫১	০.১৭
অন্যান্য	-	৬,৪৫,০০৩	২.৯৯
মোট		২,১৬,৭৭,৫৬০	১০০.০০

Source : Talukder Maniruzzaman, Politics and Security of Bangladesh, University Press Ltd. Dhaka, 1994

Dhaka University Institutional Repository

এ নির্বাচনে সেনাধিনায়ক জেনারেল এরশাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার ২৭ নভেম্বর ৪২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে । তিনি জেনারেল এরশাদের দাবী অনুযায়ী ১লা জানুয়ারি ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠিত হয় । কিন্তু জেনারেল এরশাদ নবগঠিত 'নিরাপত্তা পরিষদের' মন্ত্রীর সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রত্যাখান করেন । রাষ্ট্রপতি সাত্তার দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন । রাষ্ট্রপতি সাত্তারের প্রায় চার মাসের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দু'বার মন্ত্রিপরিষদ ও একবার জাতীয় পরিষদ নতুন করে গঠন করতে বাধ্য হন । তাঁর অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা থাকায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন । কিন্তু আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এমনই অবনতি ঘটে যে, যুব-মন্ত্রীর সরকারী বাসভবন থেকে এক কুখ্যাত খুনের আসামীকে গ্রেফতার করা হয় । জেনারেল এরশাদ তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন । তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে নীল নকশা প্রণয়ন করেন । জেনারেল এরশাদ সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় সেনা ভবনে দৈনিক সংবাদ সংস্থারসমূহের সম্পাদকদের সমাবেশে প্রেস কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন । এবং সেনাবাহিনীর বিধি-শৃংখলাকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন সভায় রাজনৈতিক নেতার মত বক্তৃতা দিতে থাকেন । এরপর জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত বি.এন.পি. সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির অভিযোগ এনে সুপরিকল্পিতভাবে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটায় । ফলে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে । এ সময় ক্ষমতাসীন বি.এন.পি. সরকারের একাংশ জেনারেল এরশাদের সাথে আঁতাত করে । তিনি সুকৌশলে সামরিক আইন জারির পক্ষে সেনাবাহিনীর সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হন । জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি সাত্তারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আইন-শৃংখলার চরম অবনতির অজুহাতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সারাদেশে সামরিক আইন জারি করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় । তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি ড.এম.এ. হুদা অবিলম্বে এরশাদকে বরখাস্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন । কিন্তু তার পূর্বেই জেনারেল এরশাদের চাপের মুখে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন । অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাত্তার আইন-শৃংখলা রক্ষায় যে ভূমিকা পালন করেছিলেন । কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসেবে সেই দায়িত্ব পালনে সাহসিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন ।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. M. Nazrul Islam, "*Parliamentary Democracy in Bangladesh An Assessment*", *Perspectives in Social Science*, Vol. 5, University of Dhaka, October 1998, p.55

২. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯৭, পৃ. ১১১, ১১৫-১১৭ ।

৩. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, "বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও বাকশাল প্রবর্তন ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ," (পিএইচ. ডি.) অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৬৬ ।

৪. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৯

৫. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০ ।

৬. M.Nazrul Islam, op. cit. p. 56-57.

৭. Talukder Muniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its after math*, University Press Ltd, Dhaka, 1988, p. 186-188, 203-234.

৮. মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ) বীর বিক্রম, একজন জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৮ ।

৯. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics : Problems and Issues*, University Press Ltd, Bangladesh, 1980, pp. 205-209, 211.

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (১৯৮৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ১৯৯০, পৃ. ১৮০ ।

১১. হাসানউজ্জামান, "বাংলাদেশে সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া এবং জিয়া শাসন", মুস্তফা মজিদ (সম্পাঃ), রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪,পৃ.৫৯।

১২. দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, এপ্রিল ১৭, ১৯৭৯, পৃ. ১ ।

১৩. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুন গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২০-২১ ।

১৪ এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৮

১৫. মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-'৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৫-৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পটভূমি ও কৌশল

বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর ইতিহাস অভ্যুত্থানের ইতিহাস । ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ২৪ আগস্ট সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারলে শফিউল্লাহকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ করা হয় এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর প্রধান হন । ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফেরে নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটে এবং ৭ নভেম্বর সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান পুনরায় সেনা বাহিনীর প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন । তিনি প্রথমেই 'হ্যাঁ' - 'না' ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার বৈধতা অর্জন করেন এবং পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন । তিনি মেজর জেনারেল এরশাদকে সেনাবাহিনীর ষ্টাফ প্রধান নিয়োগ করে লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দিলেন । জেনারেল এরশাদ অতি আনুগত্যের সাথে সেনা বাহিনীর প্রধান হিসেবে কাজ করে যেতে থাকেন । কিন্তু পশ্চাতে ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে, এই ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হলো জেনারেল মঞ্জুরের ডিভিশনে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারের সমাবেশ ঘটানো হয় । তিনি পদাধিকার বলে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হন । এ সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল বি.এন.পি.-তে কোন্দল শুরু হয় চট্টগ্রামে । তা নিরসনের জন্যে তিনি চট্টগ্রাম গমন করেন ।[১] এবং সেখানে এক সেনা বিদ্রোহে ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হন । তখন জাতির সংকটময় মুহূর্তে বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ।

Dhaka University Institutional Repository

এ নির্বাচনে বিজয়ের প্রধান কারণ ছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি ও সেনাবাহিনীর সমর্থন । নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করেছিলেন । অপরদিকে জেনারেল এরশাদও তাঁর অবস্থানকে সেনাবাহিনীর মধ্যে সুদৃঢ় করার জন্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন । তিনি বিচারপতি সাত্তারের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন এবং সারা দেশে সুপরিকল্পিতভাবে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটানো হয় । রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে বি.এন.পি. সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আইন-শৃংখলার অবনতি ও স্বজন প্রীতির অভিযোগ এনে জেনারেল এরশাদ বলেন, জাতিকে সংকটময় মুহূর্তে এগিয়ে আসেতে হবে তাঁর নিজের স্বার্থে নয় দেশের স্বার্থে । এ দোহাই দিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন ।[২]

Dhaka University Institutional Repository

২.১ সামরিক শাসন '৮২

জেনারেল এরশাদ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি মন্ত্রিপরিষদ, ও সংসদ বাতিল এবং সংবিধান স্থগিত করেন । এরপরই ২৭ মার্চ বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে নামেমাত্র রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয় । আর জেনারেল এরশাদ হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক । তিনি জানতেন ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ যেভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন তা অবৈধ । প্রথমে শাসন ব্যবস্থাকে বৈধ করার প্রয়াস চালান । তিনি সামরিক শাসনকে বলেছেন, 'জনগণের সামরিক শাসন' রাজনৈতিক নেতাদের হাতে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন এ অজুহাতে ক্ষমতা দখল করে বলেন, আর কিছুদিন পর সামরিক শাসন জারি হলে দেশের মানুষ অনাহারে মারা যেত । 'সীমাহীন দুর্নীতি'র কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় এসেছে ।[৩]

ক্ষমতা দখলের পর সারাদেশে কয়েকটি ' বিশেষ সামরিক আদালত' ও 'সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত' গঠন করেন । সামরিক আইন ও প্রশাসন পরিচালনার জন্যই যা পরিবর্তনের প্রয়োজন তা করা হয় । যে সব অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকার উৎখাত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সেই সকল অভিযোগ যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেশবাসীকে দেন । তিনি ঘোষণা করেন, আইন-শৃংখলা ফিরে এলে এবং গণতন্ত্রের অনুকুলে পরিবেশ সৃষ্টি হলে তাঁরা ব্যারাকে ফিরে যাবে । এতে সাধারণ মানুষ সান্তনা লাভ করল । ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খাঁনও একই ঘোষণা দিয়েছিলেন । কিন্তু দশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন । জেনারেল জিয়াউর রহমানও এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন । ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় । নির্বাচিত সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা-অক্ষমতা, দেশের অর্থনৈতিক সংকট ও আইন-শৃংখলার অবনতি ইত্যাদির অভিযোগে বিচারপতি সাত্তারের সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় । তাঁরা ওয়াদা করেছিলো এ সকল সমস্যা সমাধান করবে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেল । এ

Dhaka University Institutional Repository

সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক অঙ্গনে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিন্দুমাত্র অধিকার নেই ।[৪]

১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্রে জেনারেল এরশাদ বিপন্ন অর্থনীতি, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দল, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, জনগণ চরম হতাশা-নৈরাজ্যে নিমজ্জিত, দেশ ও জনগণের প্রতি সশস্ত্র বাহিনী দায়িত্বশীল হিসেবে সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে । সামরিক আইন ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয় ঃ

"যেহেতু দেশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, বেসামরিক প্রশাসন কার্যকর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচেছ, সকল স্তরে সীমাহীন দুর্নীতি জীবনের অংশ হয়ে ওঠায় জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । আইন- শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি সম্মানজনক জীবন যাপন, শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছে । রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে, যেহেতু দেশের জনগণ চরম দিশেহারা অবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত, যেহেতু জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর দায়িত্ব বর্তেছে । যেহেতু আমি লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে ২৪ মার্চ ১৯৮২ বুধবার হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করছি এবং এ মুহূর্ত থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলে ঘোষণা করছি । প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছি" ।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল এরশাদ কর্তৃক সামরিক শাসন ঘোষণার পর এই দিনই ২৪ মার্চ ১৯৮২ বিচারপতি আবদুস সাত্তার বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণে বলেন ঃ

"দেশের আইন-শৃংখলা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, জাতীয় স্বার্থে সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । সারা জীবন আমি ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করেছি এবং সর্বদাই দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সার্বিক অবস্থার যাতে উন্নতি হয় তাই কামনা করছি । দেশের বর্তমান এই অবস্থায় দেশের জন্য রয়েছে আমার আন্তরিক মঙ্গল কামণা । আমি পরম করুণাময় আল্লাহতালার কাছে এই মোনাজাতই করি যে তাঁর অশেষ রহমতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে শান্তি, ন্যায় বিচার, প্রগতি ও সমৃদ্ধির এক নবযুগের সূচনা হবে ।

বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং আমাকে সব রকমভাবে সাহায্য করার জন্যে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ।

আমাদের দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য দেশ প্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর এই মহান প্রচেষ্টার আমি সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি । জাতির প্রয়োজনে দেশের জন্য আমি যেকোন কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না । পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন ।" [৬]

এ প্রসঙ্গে জেনারেল এরশাদ অনেকবার বলেছেন, রাষ্ট্রপতি সাত্তার তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন । কিন্তু বিচারপতি সাত্তার নিজে সামরিক আইন জারি করেন নি, সামরিক আইন জারি করেছেন জেনারেল এরশাদ এবং সামরিক আইন জারির পরই রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে দিয়ে এ ভাষণ দেয়া হয় ।

জেনারেল এরশাদ চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা । আর ক্ষমতাসীন দল তারই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো । রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্ব আর রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বর্ণসূত্রে জড়িয়ে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল । জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর দলীয় কোন্দল উন্মুক্ত হয় । পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

বি.এন.পি. দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় । ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এগিয়ে এলে দলীয় কোন্দল জনসমক্ষে প্রকাশ পায় । কে হবেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী ? শাহ আজিজ, না নুরুল ইসলাম শিশু ? মীর্জা গোলাম হাফিজ, না বদরুদ্দোজা চৌধুরী ? শেষ পর্যন্ত বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয় । তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় বলেন, "প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আস্থাভাজন আমি । দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীরও শ্রদ্ধেয় আমি" বিচারপতি সাত্তার এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন । তিনি প্রথমে জেনারেল এরশাদের প্রতি দুর্বল ছিলেন । পরে তাঁর এ ভুল ভাঙ্গল, নির্বাচনের পরে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে শান্তিতে থাকতে দেননি । এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের চাপে বিচারপতি সাত্তারকে গঠন করতে হয়েছিলো উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ও তিন বাহিনীর প্রধানদের সমন্বয় 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' । জেনারেল এরশাদের চাপের মুখে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করেও শেষ রক্ষা হয়নি । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য সেনাবাহিনী প্রধানের সীমাহীন লোভ, অপর দিকে দলীয় কোন্দল ও বিশৃংখলা এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । রাষ্ট্রপতি সাত্তার শেষ পর্যায় জেনারেল এরশাদকে অপসারণের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু তা বাস্তবায়িত হবার পূর্বেই বিচারপতি সাত্তারকে পদচ্যুত করা হয় ।[৭] । এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাস অন্য রকম হতো ।

জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার দশ মাস পরে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিলেন জেনারেল এরশাদ । তিনি এই দশ মাস সময় নিয়েছিলেন সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির জন্যে । জেনারেল এরশাদ সরকার পরিচালনায় ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করতে থাকেন । উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন কিনা তা নিরসনের লক্ষ্যে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্যে আইনগতভাবে যোগ্য করা হয় । তাতেও জেনারেল এরশাদের সমর্থন ছিলো । তিনি নিজে স্বীকার করে বলেছেন, "সাংবিধানিক সংকট থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীকে একাজ করতে হয়েছে" । নির্বাচনের পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে চরম কোন্দল, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা দখলে উৎসাহী করেছিল । কারণ জেনারেল জিয়াউর রহমান একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন । সেই ব্যর্থতার ফলে জেনারেল এরশাদের আগমন ঘটে । তাছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রিসভায় সামরিক বাহিনী অফিসারদের স্থান দেয়ায় সেনাবাহিনী উচ্চাভিলাসী হয়ে উঠে । জেনারেল এরশাদ নিজেই সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ 'A Soldier Speaks ' বলেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে তাচ্ছিল্য করেছেন, জাতি গঠন ও রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকাকে উপেক্ষা করে । সমাজ ও জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেনাবাহিনী জাতি গঠনের ভূমিকাকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়নি ।[৮]

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সামরিক শাসিত দেশগুলোর ন্যায় অজুহাত দাড় করে গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারকে অপসারণ করা হয় । সম্পূর্ণ বেআইনী ও অবৈধভাবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জেনারেল এরশাদ ত্রাণকর্তা হলেন । তৃতীয় বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও সামরিক শাসনের পক্ষে নিরংকুশ সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়নি । বস্তুত সামরিক আইন দেশের সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নয় । সংবিধানের বিধি মোতাবেক একটি ক্ষমতাসীন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হলে নির্বাচনের মাধ্যমে আর একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হবে । তাই দেশের কোন আইনে সামরিক আইন জারি করা যুক্তি সঙ্গত নয় । এ কারণে সামরিক শাসকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করে । তাঁরা কখনো 'হ্যা' - 'না' ভোট বা কারচুপির নির্বাচনের প্রয়াস চালায়, শেষে এ অপচেষ্টা সফল হলেও রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনে সক্ষম হয়নি । ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির পর জেনারেল এরশাদ সরকার ৫টি লক্ষ্য ঘোষণা করেন । (এরশাদের পূর্ণাঙ্গ ভাষণের জন্য পরিশিষ্ট - ১ দ্রষ্টব্য)তা হলো - "(১) ৭ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন (২) সরকারী খাতে অপচয় হ্রাস (৩) বেসরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দান (৪) খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন (৫) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ও বাস্তব পন্থা গ্রহণ। "এরপর নয় বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু এ ৫টি লক্ষ্যের কোনটিই অর্জিত হয়নি ।[৯] কিন্তু এ সব জেনারেল এরশাদের শাসনামলে বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়া দুরূহ ছিলো ।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর ক্ষমতাকে বেসামরিকীকরণ করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন । এ প্রক্রিয়ার মধ্যে ১৮ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন, রাজনৈতিক দল গঠন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, গণভোট, সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অন্যতম । জেনারেল এরশাদ জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

আস্থা অর্জনের জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর এ পদক্ষেপের মধ্যে ছিলো প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন, মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা, সচিবালয়ের পুনর্বিন্যাস, বিচার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, নতুন শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, ঔষধনীতি, কৃষি পরিকল্পনা, ভূমি সংস্কার, বৈদেশিকনীতি এবং উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । কিন্তু তা-তেও তিনি রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনে ব্যর্থ হন । রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রিসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো, এর মূল দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা । তাঁর শাসনামলে সামরিক ও বেসামরিক আমলার প্রাধান্য অব্যাহত থাকে । গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় । ১৯৮৮ সালের মে মাস পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে আমলা ১৩ জন, বেসামরিক আমলা ৯ জন, বুদ্ধিজীবী ৭ জন ও ব্যবসায়ী ছিল ৬ জন । এই ক্যাবিনেটের অধিকাংশ মন্ত্রী ছিলো অনভিজ্ঞ । আর জেনারেল এরশাদ ছিলেন সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী । এরশাদের এ ব্যবস্থাকে "প্রেসিডেন্শিয়াল পদ্ধতিই নয় বরং এটাকে প্রেসিডেন্শিয়াল লেভিয়াথান (Presidential Leviathan)' হিসেবে অভিহিত করা যায়" ।[১০] কেননা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি হলো চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২ - '৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১,
পৃ.৩৪-৩৭

২. Emajuddin Ahamed, *Military Rule the Myth of Democracy*, University Press Ltd., Dhaka, 1988, p. 131

৩. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৬

৪. আতাউর রহমান খাঁন, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৫, ১৬

৫. প্রাগুক্ত, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৮৫

৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১২

৭. এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬০

৮. আমির খসরু, "সামরিক আমলাতন্ত্রের পেশাদায়িত্ব এবং রাজনীতিতে বৈধতার সংকট," মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.) রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৩ -৭৪

৯. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, প্রাগুক্ত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২,
পৃ. ৮৫- ৮৬

১০. মোহাম্মদ সোলায়মান, "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট ঃ এরশাদের শাসনকাল", রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

২.২ আইন-শৃংখলা ও দুর্নীতির মুলোৎপাটনের প্রতিশ্রুতি

রাষ্ট্রপতি সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্বের কারণে আইন-শৃংখলার মারাত্মক অবনতি হয় । তখন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এমনি অবনতি ঘটে যে, এক খুনের আসামীকে গ্রেফতার করা হয় মন্ত্রীর সরকারী বাসভবন থেকে । আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করতে বিচারপতি সাত্তারের সরকার দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো । অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল এরশাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া এবং তাঁর কর্মকাণ্ডে ভীতশ্রদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার তাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত দিলেন । এবং ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ তিনি রাজনৈতিক নেতাদের পুনর্বিন্যাস এবং নতুন সেনাধিনায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি ।[১] এর পূর্বেই জেনারেল এরশাদের চাপের মুখে রাষ্ট্রপতি সাত্তার ২৪ মার্চ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন । জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে, অঙ্গীকার করেন রাজনীতিতে কখনো জড়িত হবেন না । এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন দুর্নীতির মুলোৎপাটন, অর্থনৈতিক উত্তরণ, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অঙ্গীকার করেন । সাত্তার সরকারের দুর্বলতা, আইন-শৃংখলার অবনতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং দুর্নীতিতে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পথ সুগম হয়েছিলো ।[২]

যদিও তিনি একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতে করে ক্ষমতা দখল করেছেন তবুও তাঁর প্রতিশ্রুতি কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিলো । কিন্তু এরশাদ সরকারের আমলে এসব লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি ।

জেনারেল এরশাদ ২৩ মার্চ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কনফারেন্স আহ্বান করে বলেন, রাষ্ট্রপতি তাকে বরখাস্ত করতে যাচেছন । এবং দেশে আজ আইন-শৃংখলার চরম অবনতি ঘটেছে । তাই জাতির এ ক্লান্তিলগ্নে সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হবে দেশ ও জাতীর স্বার্থে এবং সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে । তিনি এভাবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে সমাজকে পরিণত করেন দুর্নীতির আশ্রমে । ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির সাথে সাথে দুর্নীতির দায়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বি.এন.পি. সরকারের মন্ত্রী, কয়েকজন শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয় । এভাবে জেনারেল

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ বোঝাতে চেয়েছেন যে, দুর্নীতি দমনে তিনি বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের বোঝালেন উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এরশাদের সরকার নিরাপদ । এরপর তিনি ঘোষণা করেন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে । তখন দেশবাসী আশা করেছিলো একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এবং শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে । জেনারেল এরশাদ আরও বলেছিলেন, "বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জন করা হবে । কৃচ্ছতা সাধন ও প্রশাসনিক ব্যায়হ্রাস এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করা হবে" ।[৩]

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল এরশাদ বলেন, সামাজিক, রাজনৈতিক বিশৃংখলা, নজিরবিহীন দুর্নীতি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, প্রশাসনিক স্থবিরতা, আইন-শৃংখলার অবনতি, খাদ্য সংকট, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের হুমকির অজুহাত দিলেন । তিনি আরও বলেন, এ সরকারের প্রতি দেশবাসীর কোন আস্থা নেই । ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন বৈধতার জন্য বেসামরিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন । যদিও তিনি সামরিক থেকে বেসামরিক সরকারে রূপান্তরে ব্যর্থ হন । জেনারেল এরশাদ সর্বদাই সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন । কিন্তু বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন না । তিনি নিজ স্বার্থে অনেক বেসামরিক মন্ত্রী নিয়োগ করলেও দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো উচ্চ পর্যায় সামরিক বৈঠকে ।[৪] তিনি এ নির্ভরতা কখনো কাটাতে পারেনি । যার ফলশ্রুতিতে জনসাধারণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী জেনারেল এরশাদ পরে নিজেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন । তাছাড়া তিনি আরও বলেছিলেন, দেশে এমনই একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আর্থ-সামাজিক জীবন ধ্বংসের মুখে এসে দাড়িয়েছে । বেসামরিক প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে । আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি, শান্তি-শৃংখলা, স্থিতিশীলতা এবং সম্মানের সাথে জীবন নির্বাহ করা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে । দেশের প্রতি কর্তব্য উপেক্ষিত, ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীন কোন্দল জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে । দেশের জনগণ আজ এক চরম নৈরাশ্য, হতাশা ও অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত হয়েছে ।[৫]

এরপর দেশবাসী আশা করেছিলো আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, দুর্নীতির মুলোৎপাটন ঘটবে এবং দেশে অর্থনৈতিক সংকটের অবসান হবে । কিন্তু সামরিক শাসন জারির অল্প দিনের মধ্যে এ

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয় । আর্থ-রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক অংগনে যে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো, তা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করতে সক্ষম । এ সব পদক্ষেপকে বিপ্লবী সংস্কার, দেশ গড়ার উদ্যোগ ও ঔপনিবেশিক জরাজীর্ণ ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের মহান প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয় ।[৬]

১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পরে একটি পদক্ষেপ গৃহীত হয় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে কেন্দ্র করে । সংবিধান অনুসারে প্রধান বিচারালয় মাত্র একটি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট । সুপ্রীম কোর্টের দু'টি বিভাগ, একটি আপীল বিভাগ, অপরটি হাইকোর্ট বিভাগ । এ দু'টি বিভাগের প্রধান একজন । তিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারকার্য পরিচালনা করেন আপীল বিভাগে । কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন । ১৯৮২ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখ থেকে হাইকোর্ট বিভাগকে প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করে তিন জেলা সদরে স্থগিত করা হয় । প্রথম তিনটি বেঞ্চ যশোর, কুমিল্লা এবং রংপুর জেলা সদরে স্থাপন করা হয় । পরবর্তীতে সৃষ্টি করা হলো আরও তিনটি বেঞ্চের বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে । আর ঢাকায় একটি হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ রাখা হলো । ফলে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি বেঞ্চ স্থাপিত হয় । কিন্তু এ ব্যবস্থাটি সংবিধানের ৯৪ ও ১০০ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলে ১৯৮২ সালে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সমিতি এর বিরোধিতা করেছিলো । এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে তাঁরা সুপ্রীম কোর্টের আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগ বর্জন করে । জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বললেও তিনিই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । আইন-শৃংখলা ও দুর্নীতির মুলোৎপাটন এবং আর্থ-সামাজিক আর রাজনৈতিক বিশৃংখলার অজুহাতে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিলেন । অথচ জেনারেল এরশাদ দুর্নীতির মুলোৎপাটনের পরিবর্তে নিজেই সীমাহীন দুর্নীতিতে ব্যাপৃত হন ।[৭]

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সামরিক শাসকের ন্যায় জেনারেল এরশাদ তাঁর সামরিক শাসনকে উন্নয়ন ও জনমুখী প্রশাসক হিসেবে পরিচিত করার প্রয়াস চালান । এ দৃষ্টিভঙ্গির অংশ স্বরূপ তিনি জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর, প্রশাসনের ব্যায় হ্রাস এবং দুর্নীতি দমন এ সকল কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । এর পর শুরু করেন সমর্থনের ভিত্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ গঠনের প্রচেষ্টা ।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে নব্য শক্তিতে আবির্ভূত হলো । দুর্নীতিও সহস্রগুণ বেড়ে গেল । আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটলো । অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে পড়ল স্থবির । প্রশাসনিক কাঠামো হলো বিপর্যস্ত ।[৯]

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় থাকার জন্য এমন কোন কাজ বা পন্থা নেই যা তিনি করেননি । ক্ষমতা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার সকল চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর সহযোগীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায় । নয় বছরের স্বৈরতান্ত্রিক এবং দুর্নীতি পরায়ন শাসনের অবসান হয় ।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা,১৯৬১, পৃ. ২৩,২৪

২. Lawrence Ziring, *Bangladesh, From Mujib to Ershad An Interpretive study*, University Press Ltd., Dhaka, 1992, p. 153

৩. মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.৪৭,৫২,৫৫

৪. আমির খসরু, "আমলাতন্ত্রের পেশাদায়িত্ব এবং রাজনীতিতে বৈধতার সংকট", মুস্তাফা মজিদ (সম্পা.) রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র , প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮,৭৫

৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), গণআন্দোলন ১৯৮২-'৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.১১

৬. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১৯, ১২০

৭. এম.এস.এম. নাসিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৩৯

৮. শওকত আরা হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ৩৬

৯. আতাউর রহমান খাঁন, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৭

১০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পাঃ), নব্বুই-এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা; ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসন বৈধতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন । তিনি এতে ব্যর্থ হন । জেনারেল এরশাদ সব সময় সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন । তিনি প্রায় সকল বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বই সামরিক বাহিনীর উপর অর্পন করেন । জেনারেল এরশাদ কখনো বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না ।[১] ফলে তিনি রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি । রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন শুধু আনুষ্ঠানিক বা রীতি সিদ্ধ হলেই চলে বা এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক বৈধতা । রাষ্ট্র বিজ্ঞানী লুসিয়ান ডালুপাই বৈধতাকে ব্যাখ্যা করেছেন রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসেবে । তাঁর মতে, " কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ গঠনে নির্বাচক মণ্ডলীর সুস্পষ্ট সম্মতি আছে কিনা এবং সরকারী কার্যক্রম জন স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার ওপর নির্ভর করে বৈধ কর্তৃত্ব ও কাঠামোর প্রকৃতি" ।[২]

রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের জন্যে জেনারেল এরশাদ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেনি । এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে ছিলো গণভোট, উপজেলা নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ইত্যাদি । তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে বৈধতার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে যায় । যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম হননি ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ গণভোট '৮৫

জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের জন্যে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিলের সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলকে অংশ গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়েছিলো । ঐ সময় বিরোধী দলকে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাতে নির্বাচনের তারিখ ৪ বার পরিবর্তন করতে হয়েছিলো । বিভিন্ন সময়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ সাধারণ নির্বাচনে বিরোধীদলকে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ছিলেন । এ জন্যেই তিনি সামরিক ট্রাইবুনাল ও জনদলীয় মন্ত্রিসভা বাতিল করে ছিলেন । তিনি ক্ষমতা বৈধকরণ এবং নির্বাচনের পথকে প্রশস্ত করার জন্যে গণভোটের আয়োজন করেন । তা-ই প্রেসিডেন্ট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১ মার্চ এক গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন । তাঁর সরকারের নীতি ও কর্মসূচি এবং সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপর জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এক গণভোটের আয়োজন করা হয় । 'হ্যাঁ' - 'না' এ পদ্ধতিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় । উপরোক্ত বিষয়ে জনগণের আস্থা থাকলে 'হ্যাঁ' বাক্সে ও আস্থা না থাকলে 'না' বাক্সে ভোট দিতে হবে । স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এটি ছিলো দ্বিতীয় গণভোট । প্রথম গণভোটে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নীতি ও কর্মসূচির সমর্থনে । ১৯৪৭ সালের পর এ উপমহাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলো ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসনামলে ।[৩] তিনিও জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি ।

জেনারেল এরশাদ তাঁর শাসন বৈধতার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করেন । তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করে অসংখ্য বিরোধী নেতা ও কর্মীকে জেলে আটক করে সারাদেশে সামরিক রাজত্ব কায়েম করেন । ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ তারিখে দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, জেনারেল এরশাদের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য । উক্ত গণভোটে লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিপুল আস্থা ভোট পেয়েছিলেন ।[৪] গণভোটে কোন প্রতিপক্ষ না থাকায় উৎসাহী কর্মীরা হাজার হাজার ব্যালট পত্র 'হ্যাঁ - বাক্সে দিয়ে ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে । তাঁরাই আবার 'না' বাক্সে নগণ্য সংখ্যক ব্যালট পত্র ফেলে । কিন্তু বাস্তবে শতকরা ১০-১৫ শতাংশ ভোটও জনগণ প্রদান করেনি ।[৫]

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রদত্ত ভোট ৭২.২ শতাংশ এবং আস্থাসূচক ভোট লাভ ৮৪.১৪ শতাংশ । কিন্তু জেনারেল এরশাদের এই নির্বাচন ছিলো প্রহসনমূলক । তখন দেশের সকল বিরোধী জোট এ গণভোট প্রত্যাখ্যান করে ।[৬] এভাবে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতাকে বৈধ করার চেষ্টা করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ আমীর খসরু, "সামরিক আমলাতন্ত্রের পেশাদারিত্ব এবং রাজনীতিতে বৈধতার সংকট",মুস্তফা মজিদ (সম্পাঃ) রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৫

২ মোহাম্মদ সোলায়মান, "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট ঃএরশাদের শাসনকাল", রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ২৭-২৮

৩ দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২১-২৩ মার্চ, ১৯৮৫

৪ আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩৩

৫ আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৬৩

৬ See The Times (English Daily News paper), "*Helpers Ensure Ershad win Bangladesh poll and Propaganda Victory*," London, 22-23 March, 1985

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ উপজেলা নির্বাচন '৮৫

জেনারেল এরশাদ তাঁর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী উপজেলা নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছেন । কারণ ১৯৮৩ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ঐক্যজোট উপজেলা নির্বাচনের বিরোধিতা করে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে । রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ দেশের জনগণকে গণতন্ত্র উত্তরণের প্রতিশ্রুতি দেন । তার আলোকে প্রাথমিক পর্যায় সামরিক সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । ১৯৮২ সালের অক্টোবরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে, থানাগুলিকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । এবং থানা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছে সকল কর্মকর্তা দায়ী থাকবে, যতদিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হয় তাঁর পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার দায়িত্ব পালন করবেন । সর্ব প্রথম ৩৫টি থানাকে উন্নীত থানা ঘোষণা করা হয় । পরে বাকী থানাগুলোকেও পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হবে । ডিসেম্বরে এক অর্ডিন্যান্স জারি করে অল্প দিনের মধ্যেই চারশতটি থানাকে উন্নীত করা হয় । ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে এ অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে উন্নীত থানার পরিবর্তে উপজেলা নামকরণ করা হয় । এবং থানা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাম দেয়া হলো । নব্য উপজেলার সৃষ্টিতে মহকুমা প্রশাসন বাতিল করা হয় । সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হলে ৬৪টি জেলার সৃষ্টি হয় । থানা পরিষদের স্থলে উপজেলা পরিষদ নামকরণ একটি বিপ্লব সাধিত হলো ।[১]

এজন্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অক্টোবর মাসের শেষভাগে ১৫ দল ও ৭ দলের জোটসমূহ ৫ দফা আদায়ের আন্দোলনে মাঠে নামে । এ দিকে জেনারেল এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের পর তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ স্পষ্ট হয়ে উঠে । তিনি ১ এপ্রিল ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেন । জেনারেল এরশাদ ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে বেতার ও টেলিভিশনের এক ভাষণে বলেন, ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও তার আগে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের উদ্যোগে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালিত হয় । সরকারের কঠোর দমণনীতির ফলে সহিংসতার রূপ ধারণ করে । সরকার সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । এবং এ পরিস্থিতিতেই উপজেলা নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন । ২৮ ফেব্রুয়ারি উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল ফুলবাড়িয়া এলাকায় এলে পুলিশ মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দেয় তাতে সেলিম ও দেলোয়ার নিহত হয় । প্রতিবাদে ১ মার্চ হরতাল পালিত হলো । সরকার গণআন্দোলনের মুখে উপজেলা নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হয় । বিরোধী দলগুলো অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়, দাবি আদায় না হলে আন্দোলন চলবে । সরকার নির্বাচনের তারিখ পিছিয়েও বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয় ।[২]

জেনারেল এরশাদ ১৪ অক্টোবর প্রকাশ্য রাজনীতি করার অনুমতি দেন । সামরিক শাসন জারির পর এ প্রথম প্রকাশ্য রাজনীতি করার ঘোষণা দেন । তিনি ঘোষণা করেন, ১৯৮৪ সালের ২৪ মে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । তার আগে ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচন হবে । জেনারেল এরশাদ সর্ব প্রথমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যুক্তি দেখান যে, স্থগিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির কথা আছে । সেই অনুযায়ী দুটি রাষ্ট্রপতি এবং একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো । বিরোধী দলসমূহ এ সময় ৫ দফা দাবি উত্থাপন করে । পাঁচ দফা দাবি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

"১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ।

২. অবিলম্বে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর হইতে সকল বিধি নিষেধ তুলিয়া লইতে হইবে ।

৩. দেশে যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে আগামী শীত মওসুমের মধ্যেই সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে, নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে । সকল জাতীয় ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যাস্ত থাকিবে । সংবিধান সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকিবে, অন্য কাহারও নয় ।

৪. রাজনৈতিক কারণে আটক, বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে ।

৫. মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার তদন্ত, বিচার ও দোষীদের শাস্তি এবং নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে " ।[৩]

১ নভেম্বর বিরোধী জোটসমূহ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে । হরতাল চলাকালে শান্তিপূর্ণ মিছিলে বোমা হামলা করা হয় । নভেম্বর মাসের শেষভাগে জেনারেল এরশাদ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি নতুন দল গঠনের নির্দেশ দেন । এর নামকরণ করা হয় ' জন দল' । ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরী এ নতুন দল গঠনের ঘোষণা দেন । তিনি চেয়ারম্যান, শামসুল হুদা চৌধুরী সেক্রেটারী জেনারেল, ৭ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ২ জন জয়েন্ট সেক্রেটারী ও ২০৮ জন সদস্য নিয়ে দল গঠিত হয় । শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগানে পরিস্থিতি তীব্রতর হলে, বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরী তাঁর ভাষণ অসমাপ্ত রেখে সভাস্থল ত্যাগ করেন ।[৪] পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিরোধী দলগুলোর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালিত হয় । এখানে কয়েক হাজার লোকের সমাবেশ হয় । পুলিশ এবং বিক্ষোভরত জনতার মধ্যে সংঘর্ষে সামরিক বাহিনী তলব করা হয় । এ সংঘর্ষে ৪ জন নিহত ও শতাধিক পুলিশসহ অনেক লোক আহত হলো । বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা গৃহবন্দী হন । বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হয় । ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরীকে অপসারণ করে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । ১৯৮৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন । এ ভাষণে বলেন, ২৭ মে সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । এরপর জেনারেল এরশাদ প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন প্রবীন রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খানকে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে সম্মত হন ।[৫] ১৯৮৪ সালের ৩০ মার্চ আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন । এ সময় জেনারেল এরশাদ বলেন, আতাউর রহমান খান আমার দলে যোগদান করতে আসেনি তিনি গণতন্ত্র উত্তরণে আমাকে সহায়তা করার জন্যই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন ।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৪ সালের ১১ ও ১২ এপ্রিল বিরোধী দলের সাথে রাজনৈতিক সংলাপের সূত্রপাত করে, ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ শুরু করেন । তবে এ সংলাপে গণতন্ত্র উত্তরণে পথ প্রশস্ত হয়নি ।[৭]

১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষভাগে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ৫ দফার দাবিতে ২২ মে ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে । এ পাঁচ দফা দাবি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"১. অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার, আই এল ও সনদ অনুসারে সভা সমিতি, মিছিল, ধর্মঘট, পছন্দমত নেতা নির্বাচনের অধিকার নিশ্চিত করা;

শিল্প নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ সালের ১৯-ক ধারা, সামরিক আইন বিধি-১৯সহ সকল কালাকানুন বাতিল, বরখাস্ত, ছাঁটাই, নির্যাতন ও দমননীতি বন্ধ, বন্দী শ্রমিকদের মুক্তি দান, চাকরির নিশ্চয়তা, নিয়োগপত্র, সার্ভিস বুক, ছুটি, কাজের ঘণ্টা ইত্যাদি প্রদান এবং লংঘনকারী মালিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

কৃষিকার্য, জুট প্রেস ওবেইলিং গুদাম ও বন্দর নির্মান কার্যেরত শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা বিধান; বরখাস্তকৃত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও প্রদত্ত শাস্তি সংগতিপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শ্রম আদালতকে প্রদান;

২. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও প্রতিষ্ঠান ঢালাওভাবে ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান বন্ধ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে দুর্নীতি ও লাভজনক শিল্পকে কৌশলে অলাভজনক দেখাইয়া বাজার দরের কম মূল্যে বিক্রয় বা হস্তান্তরের ব্যাপারে যে দুর্নীতি চলিতেছে তাহার প্রকাশ্য তদন্ত অনুষ্ঠান ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান;

দুর্নীতি ও অযোগ্যতার দরুন যে সব ব্যক্তি মালিকানাধীন কল-কারখানা বন্ধ সেগুলি যথাযথভাবে উৎপাদন চালু করার ব্যাপারে মালিকদের বাধ্য করা;

Dhaka University Institutional Repository

৩. সরকারী বেসরকারীসহ সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারী নির্বিশেষে শতকরা ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা ১৯৮১ সালের জুলাই মাস হইতে কার্যকরী করা, বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মহার্ঘ ভাতার ক্রম বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ, সস্তা দরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. অবিলম্বে শিল্প মজুরি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করা এবং ১৯৮১ সালের জুলাই মাস হইতে কার্যকর করা;

শ্রমিকদের বেতন ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী কমিশন গঠন করা, সকল কল- কারখানা, অফিস ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের জাতীয় নিম্নতম মূল মজুরি ৬৫০ টাকা ধার্য করা ; অবিলম্বে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করা, সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব বোনাস প্রদান করা;

৫. অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় হ্রাস করিয়া কল-কারখানা গড়িয়া তোলা, বিদেশ হইতে আমদানির উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা প্রযোগ করা ইত্যাদি; বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার ও গ্রাম্য জীবনের বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাস, ক্ষেতমজুর ও দিন মজুরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করণ;

বিদেশের উপর নির্ভরতা পরিহার ও সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করা" ।[৮]

এই ৪৮ ঘণ্টা হরতালে জন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এ ভয়ে সরকার ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু হয় । ক্রমাগত দু'দিন দু'রাত আলোচনার পর সরকার ও শ্রমিক ঐক্য পরিষদের প্রায় সবগুলো দাবি মেনে নিয়ে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয় । এর পর জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে সকল মন্ত্রীদের জনদলে যোগ দিতে নির্দেশ দেন । তিনি ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে, ২৭ মে জাতীয় সংসদ ও

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । বিরোধী দলের প্রধান শর্ত ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার না করলে তাঁরা নির্বাচনে যাবে না । হরতাল ও তীব্র প্রতিবাদের মুখে এ নিবাচন স্থগিত করতে বাধ্য হলো । ১৫ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, নির্বাচন কমিশন ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের তফশীল ঘোষণা করবে । ১৫ দল ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট ঘোষণা করেন, নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না । তখন জেনারেল এরশাদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি নূরুল ইসলামকে অপসারণ করে বিচারপতি এ.টি.এম. মাসুদকে নিযুক্ত করেন । কিন্তু বিরোধী দল তাতেও নির্বাচনে যেতে রাজি হয়নি । জেনারেল এরশাদ তাঁর সরকারের বৈধতা অর্জনের জন্যে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার প্রশ্নে গণভোটের ঘোষণা করেন । এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সব কর্মকাণ্ড বন্ধ ঘোষণা করা হয় । আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও জেলা সামরিক আইন প্রশাসকদের পুনর্বহাল করা হলো, সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতসসূহ আবার সচল করা হয় ।[৯]

এরূপ শ্বাস রুদ্ধকর পরিরিস্থিততে ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয় । গণভোটে আস্থা অর্জনের পর জেনারেল এরশাদ স্থগিত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিলেন । এবং নির্বাচনের তারিখ ১৬ মে ও ২০ মে ধার্য করেন । সকল বিরোধী দলের উপজেলা নির্বাচন বর্জন সত্ত্বেও সারাদেশে ১৬ মে ও ২০ মে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।[১০] বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ৪৬০ টি উপজেলার মধ্যে ২৫১টিতে ১৬ মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বাকী ২০৭ টি উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০ মে। অপর দু'টিতে দু'জন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয় ।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ দেশে প্রথম বারের মত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো । কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয় । ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ তারিখে সরকার দ্বিতীয় বারের মত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে । সে অনুসারে নির্বাচন কমিশন ১৬ ও ২০ মে নির্বাচনী কর্মসূচী ঘোষণা করেন । " ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ পুনর্গঠন অধ্যাদেশ) এবং ১৯৮৩ সালের উপজেলা পরিষদ (চেয়ারম্যান নির্বাচন) বিধিমালা" অনুসারে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । সরকার উপজেলা নির্বাচনকে অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় বলে ঘোষণা করে । ১৬ মে-ই প্রথম উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, কতিপয় কেন্দ্রে গোলযোগ ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ফলে ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায় । সেই সকল কেন্দ্রগুলোতে ২০ মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এবং বাকী ২০৭টি উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচনও এ তারিখে গোলাগুলি, সংঘর্ষ, ব্যালট-বাক্স ছিনতাই ও কারচুপির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় । এরপর ২৫ মে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ ।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-'৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা,১৯৯১, পৃ. ৭০-৭১

২. প্রাগুক্ত, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১২২-১২৩

৩. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ৮৮, পৃ. ৪৪-৪৫

৪. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৫. Lawrence Ziring, *Bangladesh From Mujib to Ershad An Interpretive Study*, University Press Ltd. Dhaka, 1974, p. 163-164.

৬. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ৮৮, পৃ. ৬৮

৭. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

৮. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ৮৮, পৃ. ৯০-৯১

৯. প্রাগুক্ত, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১২৬

১০. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩২৫-৩২৬

১১. দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৬-১৭, মে, ১৯৮৫

১২. দেখুন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৩,২১ - ২৫ মে, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ জাতীয় পার্টির জন্ম ও এরশাদের রাজনীতিতে আগমন

জেনারেল এরশাদের বেসামরিকীকরণের অন্যতম পদক্ষেপ ছিলো রাজনৈতিক দল গঠন । তাঁর দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে । প্রথমে 'জন দল' পরবর্তীতে ' জাতীয় পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠিত হয় । ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নিবাচনের সময় জেনারেল এরশাদের অনুপ্রেরণায় এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো । জাতীয় পার্টি ' দল ছুট' নীতি ভ্রষ্ট এবং ক্ষমতা লোভী রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় । তখন ক্ষমতা লিপ্সু , দুর্নীতিবাজ অনেক রাজনীতিক জাতীয় পার্টির আশ্রয় গ্রহণ করেন । এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও জাতীয় পার্টিতে যোগদানের পরে নির্দোষ হয়ে যায় । ফলে এটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংগঠনের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি । এ সংগঠনের জেনারেল এরশাদ সভাপতি ও সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন । দল ও সরকার একত্রিত হয়ে এমন কাঠামোর অধীনে ন্যস্ত হলো,যা একান্তই ব্যক্তির স্বার্থের ব্যবহারকে নিশ্চিত করা হয়েছে । তাই প্রথম হতেই দলটির ভিত্তি ছিলো দুর্বল ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ।[১] তার প্রমাণ সরকার বিরোধী আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে দলটি ।

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ কুমিল্লা স্টেডিয়ামে স্থানীয় সরকার ও সমবায় প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে বলেন, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো । দফাগুলো নিম্নরূপ ঃ

"১। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল পৌছাইয়া দেওয়া;

২। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাইয়া জাতীয় সম্পদের সম বণ্টন করা;

৩। গ্রামমুখী উন্নয়ন;

৪। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের যথার্থ বণ্টন ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি;

৫। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন;

৬। কৃষকদের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা ও তাহাদের জীবন-যাত্রার নিরাপত্তা বিধান পূর্বক ভূমি সংস্কার;

Dhaka University Institutional Repository

৭। পল্লী এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে পুজি গঠন ও সরবরাহ করা;

৮। বেসরকারী খাতের শিল্পসমূহকে উৎসাহ দান এবং বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৯। সমবায় ও কুটির শিল্প;

১০। প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পুনর্বিন্যাস এবং বিকেন্দ্রীকরণ ও কৃচ্ছতা সাধন করা;

১১। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা বিধান পূর্বক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন;

১২। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর্ম সংস্থানের সুযোগ প্রদান;

১৩। জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মহিলারা যাহাতে সমাজে নিজেদের ন্যায্য অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে,তজ্জন্য তাহাদেরকে সাহায্য করা;

১৪। জনগণকে স্বাস্থ্যে সুবিধা প্রদান;

১৫ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ;

১৬। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ;

১৭। রাজনীতিকে কাজের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করা এবং

১৮। জাতীয় জীবনে ইসলামী মুল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের ভাষা, কৃষি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখা "।[২]

তিনি ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণার পর বলেন, আমরা রাজনীতিকে কাজের রাজনীতিতে পরিণত করতে চাই । অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতার সুফল জনগণের নিকট পৌছিয়ে দিতে হবে । দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জেহাদ ঘোষণার কথা পুনঃউল্লেখ করেন । প্রতিটি থানা প্রশাসনে একটি করে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' থাকবে । এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য জনগণের সাহায্য কামনা করেন ।

১৯৮৩ সালের শুরুতে শিক্ষানীতি নিয়ে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে । তারপর তিনি বড় নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়েন । আওয়ামী লীগ ও বি.এন.পি. দু'রাজনৈতিক জোট সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে । সরকার দু'বিরোধী জোটের সাথে আলাপ-আলোচনা চালান সমঝোতার জন্য । কিন্তু শেষ মুহূর্তে জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক সমঝোতার পথ পরিহার করে সমঝোতা বানচাল করে দেন । তিনি মনোনিবেশ করেন নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের । সামরিকবাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

এবং সুবিধাবাদী রাজনীতিক সহচর নিয়ে নতুন রাজনৈতিক পাটি 'জন দল' গঠন করেন ।[৩] এরপর জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হলেন । তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তায় "নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ" নামে একটি ছাত্র সংগঠনের সৃষ্টি হয় । জেনারেল এরশাদ সামরিক বাহিনীর সকলকে খুশি রাখার জন্য তাদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করেন । তার পরই তিনি এক রাজনীতিক হিসেবে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে আত্ম প্রকাশ করলেন ।[৪]

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর জন দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে বলেন, "এ মুহূর্ত হতে আমাদের আর অতীত কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই । সকল কিছুর উপরে দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নতুন দল কাজ করে যাবে" । কিন্তু সমবেত কর্মীদের শ্লোগান, পাল্টা শ্লোগানের দরুণ বিশৃংখলার সৃষ্টি হলে 'জন দল ' ঘোষণার জন্য আহুত সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি । পরে বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী পঠিত ঘোষণাপত্র সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় । উক্ত ঘোষণায় বলা হলো জাতীয়তাবাদ, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ, গণতন্ত্র ও প্রগতি - চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আদর্শবাদ সমুন্নত রাখা ইসলামী আদর্শের পাশাপাশি সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সমাজের সর্বনিম্ন স্তর হতে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র কায়েম, জনগণের সার্বিক ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করাই 'জন দলের' মূল লক্ষ্য ।[৫]

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৪ সালের ১ মে বঙ্গভবনে ' জন দলের' নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন । ১৮ মে পালিত হয় সাংবাদিকদের ২৪ ঘণ্টার প্রতীক ধর্মঘট । ১০ জুন এরশাদের সরকার "দৈনিক দেশ" পত্রিকা এবং ৩ অক্টোবর সাপ্তাহিক "ইত্তেহাদ" ও "খবর" পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় । ২৭ অক্টোবর সরকার দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার কারণে ৮ ডিসেম্বর তারিখের অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন । ২৫ নভেম্বর জেনারেল এরশাদের চাকরির মেয়াদ সেনা বাহিনীর প্রধান হিসেবে আরও এক বছরের জন্য বর্ধিত করা হলো । ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি এক সরকারী ঘোষণায় দেশের মন্ত্রী পরিষদ ও বিশেষ সামরিক আইন বিলুপ্ত এবং

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারা পুনর্বহালের কথা বলা হয় । এবং ৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচনের নতুন তফসিল ঘোষণা করেন ।[৬]

১৯৮৪ সালের ২৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করে ছিলেন ১৮ দফা কর্মসূচি । এর সুফল জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ ও জনদলকে অবিলম্বে একীভূত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।[৭]

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি পুনরায় রাজনীতির অনুমতি দেন । তখন পাঁচ দলের সমন্বয়ে গঠিত 'জাতীয় ফ্রন্ট' একদল হিসেবে ১ জানুয়ারি আত্ম প্রকাশ করে । এ নতুন দলের নামকরণ করা হয় "জাতীয় পার্টি" । ধানমণ্ডির 'জাতীয় ফ্রন্টের' কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির ২১ সদস্য বিশিষ্ট সভাপতি মণ্ডলী, ১৮ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও ৬০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং সাবেক জনদলের নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সভাপতি মণ্ডলীর এক নম্বর সদস্য ও অধ্যাপক এম.এ. মতিন চৌধুরীকে সেক্রেটারী জেনারেল করা হয় এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব হন আনোয়ার জাহিদ । উক্ত নতুন দলের মহা-সচিব এম.এ.মতিন চৌধুরী পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "প্রেসিডেন্ট এরশাদের আর্শীবাদ ও নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাব" । আরো বলেন জাতীয় পার্টির আদর্শের মধ্যে রয়েছে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতি অর্থনৈতিক মুক্তি । অতঃপর জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১২ জানুয়ারি বায়তুল মোকাররম স্কোয়ারের অনুষ্ঠিত সভায় বলেন, " দেশের রাজনৈতিক আকাশে জাতীয় পার্টি উদীয়মান সূর্য । এ পার্টি তাঁর মূল নীতিকে সামনে রেখে ভাস্কর হয়ে উঠেছে । জাতীয় পার্টির আবির্ভাবে দেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবে। জাতীয় পাটির সাথে আমার রাজনৈতিক সমন্বয় ঘটেছে"। তিনি আহ্বান জানান জনগণকে, জাতীয় পার্টির পতাকা তলে সমবেত হয়ে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করুন । এর মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. মোহাম্মদ সোলায়মান, "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট ঃ এরশাদের শাসনকাল", রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ৩৪-৩৫ ।

২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মার্চ, ১৯৮৩ ।

৩. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯১, পৃ. ৩২ ।

৪. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.১৯৯১, পৃ. ৫৩ ।

৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৩ ।

৬. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ , দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩২০-৩২৩ ।

৭. The Bangladesh Times, 24 March, 1986.

৮. দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২-১৩ জানুয়ারি, ১৯৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৬

১৯৮৬ সালের ২ মার্চ রেডিও-টেলিভিশনে এক ভাষণে জেনারেল এরশাদ ২৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষণা করেন । ২১ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তা হলে সব রকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে । নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন প্রচার করা হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এ আদেশ আগামীকাল থেকে কার্যকর হবে"। পরদিন ২২ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয় । আওয়ামী লীগসহ ৮ দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে । জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ৭ মে পুনর্নির্ধারণ করা হয় ।[১] কিন্তু বি.এন.পি. নেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার জন্য অনড় থাকেন । ১৫ দলের ৫টি বামপন্থী দলও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৫ দল থেকে বেরিয়ে ৫ দলীয় জোট গঠন করেন । ২৪ মার্চ ছিলো জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের দিন । তা-ই এ দিনটিকে বিভিন্ন সংগঠন, দল ও জোট "কালো দিবস" হিসাবে আখ্যায়িত করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে । এ দিবস উপলেক্ষ্য বায়তুল মোকাররমে এক বিশাল জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, " আমরা নির্বাচন চাই এবং নির্বাচন করবো । নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ক্ষমতায় যেতে বিশ্বাসী" । কিন্তু জনগণের কাছে যে ওয়াদা দিয়েছি ৫ দফার, তা' বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে যেতে পারি না । এবং ৫-দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে । এই ৫ দফার জন্য ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষ রক্ত দিয়েছে । জনগণ জেল, জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করেছে । আমরা জনগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল । ১৫ দলীয় জোটও ২৪ মার্চকে 'কালো দিবস" হিসেবে পালন করে । এ জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচনী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে, ব্যালটের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান ।[২]

জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকারের অধীনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৮ দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করায় আন্দোলনগামী দল, জোট ও ছাত্র সমাজ ক্ষুব্ধ হয় । কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক-কর্মচারী, আইনজীবী, শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ সংগ্রামরত সকল সংগঠনের সঙ্গে যৌথ বৈঠকে ১৫

Dhaka University Institutional Repository

ও ৭ দলকে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে ছাত্ররা জনগণকে সাথে নিয়ে স্বতন্ত্র ধারার রাজনীতি শুরু করবে । ২৪ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও দেশব্যাপী "কালো দিবস" পালন করে । ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা আখতারুজ্জামান । তিনি বলেন, ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির পর থেকে আজ ৪ বছরে দেশ ধ্বংসের প্রান্ত সীমায় উপনীত । এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজই সর্ব প্রথম গর্জে উঠেছিলো । আরও বলেন, জাতীয় দাবী ৫ দফার লক্ষ্য হলো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া চিরতরে বন্ধ করা। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমন্বয়ে 'সংগ্রামী ছাত্র জোট' এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে । এ সমাবেশে বলা হয়, স্বৈরশাসনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য ক্ষমতাশীল ও ক্ষমতাহীন দু'শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে । ৫ দফার ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছিলো । কিন্তু আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল ৫-দফাকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তাঁরা ৫-দফার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে জাতীয় জীবনকে কলংকিত করেছে ।[৩]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, ৭ মে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক 'ম্যাণ্ডেট' । যা জাতীয় ঐক্যের সূচনা করবে । দেশের জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের এক অনুপম সেতু বন্ধন গড়ে উঠবে । এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেবল প্রশাসনিক জনমত যাচাই নয়, এর তাৎপর্য সুদূর প্রসারী । তিনি আরও বলেন, নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু বাস্তবে তিনি এর ব্যবস্থা করেন নি । ৭ মে সারা দেশের নির্বাচন হিংসাত্মক ও হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় । ২৮৪ টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায় । এদিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ করে বলেন, তাঁর দলের ২০ জন কর্মী নিহত এবং সহস্রাধিক আহত হয়েছে ।[৪]

উল্লেখ্য শেখ হাসিনা মার্চের ২০ তারিখ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে জন সভায় ঘোষণা করেছিলেন, ২২ মার্চ তারিখ মনোনয়নপত্র দাখিল প্রতিরোধ করতে হবে । যারা এ নির্বাচনে অংশ নিবে তারা 'জাতীয় বেইমান' হিসেবে চিহ্নিত হবে ।[৫] অথচ তিনি এ প্রহসনমূলক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, জাসদ (রব), জাসদ (সিরাজ) ও ওয়াকার্স পার্টি (নজরুল) ইত্যাদি দল অংশ নেয় । বি.এন.পি. নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটে এবং বামপন্থী ৫ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে । এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩, আওয়ামী লীগ ৭৬, জামায়াতে ইসলামী ১০, কমিউনিষ্ট পার্টি ৫, এন.এ.পি. ৫, মুসলীম লীগ ৪, জাসদ (রব) ৪, জাসদ (সিরাজ) ৩, বাকশাল ৩টি, ওয়াকর্স পার্টি ৩, ন্যাপ (মোজাফফর) ২, এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য সদস্যরা ৩২টি আসন লাভ করে ।[৬]

সারণী - ১

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের চিত্র

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৬
এন.এ.পি.	১০	৫	১.২৯
কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
ওয়াকার্স পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফফর)	১০	২	০.৭১
গণ আজাদী লীগ	১	-	০.৮৮
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬১
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৬.১৯
মোট	১৫২৭	৩০০	১০০

Source : Government of the People's Republic of Bangladesh. Election Commission, Report : Jatiya Sangsad Elections, 1986, Dhaka, 1988.

শেখ হাসিনা নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, কারচুপি না হলে আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেত । জামায়াতে ইসলামী দল নির্বাচনের দিন দুপুর বেলাই নিবাচন পরিত্যাগ করে, সর্বত্রই সন্ত্রাস, ভয়ভীতি ও

Dhaka University Institutional Repository

গুণ্ডামীর কারণে । জাতীয় পার্টির কর্মীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে বোমা মেরে লোকজন তাড়িয়ে দিয়ে ফাঁকা মাঠে ব্যালট বাক্স ভরে দেয় । তখন অন্যান্য পার্টির লোকজন ভয়ে পালিয়ে যায় । আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে 'মিডিয়া ক্যু' হয়েছে অভিযোগ করে । উক্ত দুস্কর্মে নির্বাচন কমিশন ও তাদের কর্মচারীবৃন্দ সহায়তা করে ।[৭]

অতঃপর প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২৫ মে নতুন মন্ত্রিপরিষদে ১৭ জন মন্ত্রী, ৫ জন প্রতিমন্ত্রী ও ৩ জন উপমন্ত্রী নিয়োগ করে নব নিযুক্ত মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ।[৮]

তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৮৬ সালের ১০ জুলাই । উক্ত সংসদের শামসুল হুদা চৌধুরী স্পিকার, এম. কোরবান আলী ডেপুটি স্পিকার, মিজানুর রহমান চৌধুরী সংসদ নেতা এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ এ অধিবেশন বর্জন করে । তৃতীয় জাতীয় সংসদে ৩৯ টি বিল গৃহীত হয়েছিলো । এই সংসদের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো সংবিধানের ৭ম সংশোধনী বিল পাশ । জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল, সামরিক শাসক হিসেবে তাঁর সকল আদেশ ও অধ্যাদেশ বৈধ বলে সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয় । তৃতীয় জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ৭ ও ১৫ দলীয় জোট সংসদ বাতিলের দাবী জানাতে থাকে । সকল জোট তৃতীয় সংসদকে 'অবৈধ' বলে চিহ্নিত করে । এ সংসদের মোট কার্য দিবস ছিলো ৭৫ দিন । মেয়াদ পুর্তির আগেই ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যায় ।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, University Press Limited, Dhaka, 1993, p. 23.

২. Lawrence Ziring, *Bangladesh from Mujib to Ershad An Interpretive study*, University Press Limited, Dhaka, 1992, pp. 195

৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃ.৪১-৪২ ।

৪. দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৭-৮ মে, ১৯৮৬ ।

৫. মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এরশাদের সময় কাল, আগামী প্রকাশনী,১৯৯১, পৃ. ৫৯ ।

৬. Muhammad A. Hakim, op. cit. pp. 25-26.

৭. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৭১-১৭৩.

৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৬ মে, ১৯৮৬ ।

৯. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দ কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৮-১৯৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন '৮৬

১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ অবৈধভাবে যে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা বৈধ করার অপচেষ্টায় এ নির্বাচন ।[১] দেশের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়ন-পত্র জমা দেয়ার তারিখ ধার্য করা হয়েছিলো ১৭ সেপ্টেম্বর । এ দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রিটানিং অফিসার কর্তৃক প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয় । ৮, ৭, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলামী দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন বিক্ষোভ দিবস হিসেবে পালন করেন । অপর দিকে জেনারেল এরশাদ শেরেবাংলা নগরে জাতীয় পার্টির ঢাকা বিভাগীয় মহাসম্মেলন শেষ করে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন । অন্যদিকে নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহম্মদ উল্লাহ্ হাফেজজী হুজুর বলেন, খেলাফত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এবং জাতির আশা পূরণের চেষ্টায় এক দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছি । দ্বীনি পাত্রে ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া আমার কর্তব্য । আর ভোট দেওয়া ভোটারদের দায়িত্ব । আরও বলেন, সরকারের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যাতে দেশ ও জাতির কল্যাণকামী ও চিন্তাশীল সকল দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারে ।

১৬ সেপ্টেম্বর জেনারেল এরশাদ বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত জনগণ নস্যাৎ করে দিবে, বাংলাদেশকে আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে, সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়নে এবং সকলের কাছে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে তার রাজনীতি 'একটি মিশন' । রাজনীতির মাধ্যমে দারিদ্রের অভিশাপ দূর করে রাজনীতিকে উন্নয়ন প্রচেষ্টার সম্পূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে । কিন্তু বিরোধী দল জনগণের ভোটাধিকারকে খাটো করার চেষ্টা করছে । তিনি দেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে জাতীয় পার্টির কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান ।[২]

১৯৮৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-সহ ১৬ জন প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন । পরে ৪ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে । আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্য জোট, বি.এন.পি. নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট, ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে । এ নির্বাচনে জেনারেল এইচ

Dhaka University Institutional Repository

এম এরশাদ, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্ হাফেজজী হুজুর,লে. কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান, কয়েকটি ক্ষুদ্র দলের প্রার্থী এবং রাজনীতিতে অপরিচিত কয়েকজন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন ।[৩] হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন । যারা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছেন তাদের নাম ও প্রতীক নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত তালিকা অনুসারে দেওয়া হলো ঃ- অলিউল ইসলাম (সুক্কু মিয়া) - কুড়ে ঘর, আলহাজ্ব মেজর (অবঃ) মোঃ আফসার উদ্দিন - তলোয়ার, মুহাম্মদ আনসার আলী- পাগড়ী, মোহাম্মদ উল্লাহ্ হাফেজজী হুজুর - বট গাছ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মজুমদার- গোলাপ ফুল, মোঃ আবদুস সামাদ- দাড়িপাল্লা, মোঃ জহির খান-নৌকা, লে. কর্ণেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান-ধানের শীষ, সৈয়দ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী- হাতের ঘড়ি, স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ) মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী-ছাতা, আলহাজ্ব মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী- খেজুর গাছ, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ-লাঙ্গল ।[৪]

৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট প্রেসিডেন্ট নিবাচনের বিরোধিতা করায় এরশাদের সামরিক সরকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । অতঃপর ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নিবাচন অনুষ্ঠিত হয় । জেনারেল এরশাদ বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ঘোষণা করা হয় । সেই দিন ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল এবং জামায়াতে ইসলামী দলের আহ্বানে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয় ।[৫] দেশ-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অভিমত, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পনের শতাংশ ভোটও ভোটারেরা প্রদান করেনি । এ নিবাচনে জেনারেল এরশাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্ হাফেজজী হুজুর ও লে. কর্ণেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান ।[৬] শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যায় অভিযুক্ত কর্ণেল (অবঃ) ফারুক রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে ।[৭]

অন্যদিকে জেনারেল এরশাদ উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের এক মহা-সমাবেশে বলেন, " বিরোধী দলের রাজনীতিকরা আপনাদের দুর্নীতিবাজ বলে । অথচ আপনারই হলেন সমগ্র দেশের ১০ কোটি মানুষের প্রতিনিধি ।" তিনি ঢাকা মহানগরীতে এক কৃষক মহা-সমাবেশে বলেন, "আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনাদের জন্য উজাড় করে দিতে পারি" । এ মহা-সমাবেশেই তাকে

Dhaka University Institutional Repository

'পল্লী বন্ধু ' খেতাব দেওয়া হয় । উক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ১১ জন প্রার্থীকে পর্যায়ক্রমে টেলিভিশনে ১৫ মিনিট বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হলো । এটি ছিলো একটি প্রহসনমূলক । জেনারেল এরশাদের সরকার বলেন, ' সেনাবাহিনীকে উস্কানি দেওয়ায় শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্র দ্রোহীতার অভিযোগে বিচার করা হবে ।' খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার বিভিন্ন জেলার জনসভায় পুলিশ বাধা প্রদান করে এবং জনসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন । অবশেষে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গৃহবন্ধী করা হয় । প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শক্তিশালী প্রার্থী না থাকায় খালি মাঠে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে দেওয়া হয় । ঐ দিন বিরোধী দলের সকাল-সন্ধ্যা হরতাল থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ।[৮]

২০ অক্টোবর সরকারীভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয় । এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২,১৭,৯৫,৩৩৭ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নিবাচিত হন । তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজী হুজুর ১৫,১০,৪৫৬ ভোট পান ।[৯] তৃতীয় স্থানে ছিলেন লে. কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান । তিনি পেয়েছেন ১১,৭৩,৭২৩ ভোট । প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৪,৩৯,১২,৪৪৩ জন ।[১০] ২৩ অক্টোবর এইচ. এম. এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের তৃতীয় নিবাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন । প্রদত্ত মোট ভোটের শতকরা ৮৩.৫৮ ভাগ জেনারেল এরশাদ লাভ করেন।[১১] তিনি বলেন, জাতির প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, সরকারের আরও বেশী গণতন্ত্রায়ন, অধিকতর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্প ভিত্তি গড়ে তোলা এবং দারিদ্র হ্রাস করে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন । অন্য দিকে ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাচ্ছি, এ সরকার ক্ষমতায় থাকার আর কোন অধিকার নেই । ৭ দল, ৫ দল এবং জামায়াতে ইসলামীসহ ছাত্র সংগঠনগুলো একই মন্তব্য করে । এ নির্বাচন আমরা মানিনা । দেশে-বিদেশে আমাদের দেশের মান-সম্মান হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে । ২৩ অক্টোবর ' কালো দিবস' উপলক্ষে ৮ দল সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জেনারেল এরশাদের সাড়ে ৪ বছরের কার্যক্রমকে বৈধ করার জন্য সংসদে যারা ভোট দেবেন, জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না ' । অপরদিকে বেগম জিয়াও দেশব্যাপী আহুত উক্ত 'কালো দিবস' উপলক্ষে বলেন, ' আসুন আমরা সামরিক শাসন জারির পর যেভাবে আন্দোলন শুরু করেছি সেভাবে আবার আন্দোলন শুরু করি' এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য আবেদন জানান । জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন । তাঁকে অপসারনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান ।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৭১-১৭৩

২. দৈনিক খবর, ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

৩. দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

৪. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬

৫. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩০

৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), গণআন্দোলন ১৯৮২-'৯০, মুক্ত ধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৮

৭. Muhammad A Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, University Press Ltd. Dhaka, 1993, p. 24.

৮. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রীত্বের নয়মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৪-১৮৫.

৯. দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২১ অক্টোবর, ১৯৮৬

১০. দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৬

১১. Lawrence Ziring, *Bangladesh From Mujib to Ershad An Interpretive Study*, University Press Ltd. Dhaka, 1992, p.199.

১২. দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৭ - ২৬ অক্টোবর, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৮

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে । এ অধিবেশনে বিগত সাড়ে চার বছরের সামরিক শাসনের বৈধ অবৈধ সমস্ত কার্যকলাপ অনুসমর্থন বা র‍্যাটিফিকেশন করা হয় । বিরোধী দল বিহীন সংসদের সপ্তম সংশোধনী বিল পাশের পর ১০ নভেম্বর সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করা হলো । এ দিন ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে নূর হোসেন ' স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এ শ্লোগান বুকে পিঠে লিখে মিছিলে বের হন । মিছিল গোলাপ শাহ্ মাজারের নিকট এলে ঘাতকের বুলেট নূর হোসেনের বুক ভেদ করে বের হয়ে যায় । বিরোধী দলের অবরোধ কর্মসূচি বানচালের জন্য সকল সড়ক ও রেল পথের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো । তা সত্ত্বেও আন্দোলন দুর্বার গতি সঞ্চার লাভ করে । বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করে। ফলে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন ।[১]

জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পরই জেনারলে এরশাদ বিরোধী দলের অংশগ্রহণ উদ্দেশ্যে নুতন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তাব দেন । বিরোধী দল এ প্রস্তাব প্রত্যাক্ষাণ করে জানান জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের কোনে বিকল্প নেই । অন্যদিকে শেখ হাসিনা বলেন, যে যুক্তিতে সংসদ বাতিল করা হয়েছে সেই একই কারণে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিল হওয়া উচিত । ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম লাল দিঘির ময়দানের জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম পৌছেন । উক্ত জনসভায় বি.ডি.আর. ও পুলিশের গুলি বর্ষণে ১৭ জন নিহত ও বহুজন আহত হয় । এ বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ২৫ জানুয়ারি অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হলো এবং ২৬ জানুয়ারি সারাদেশে সকাল- সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় ।[২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ একটি উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে । উক্ত নির্বাচনে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি, আ.স.ম.আবদুর রবের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition Party), ফ্রিডম পার্টি, শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে জাসদ (সিরাজ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ গ্রহণ করে । অপর দিকে ৮, ৭, ৫ ও জামায়াতে ইসলামী পার্টিসহ জোট ও দল এ নির্বাচন বর্জন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান । ২৫ জানুয়ারি জেনারেল এরশাদের সরকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । ৩ মার্চ বিরোধী জোট ও দল ৩৬ ঘন্টা বিরতিহীন দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে । সেদিন রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়েছিলো । তখন প্রধান রাস্তাগুলো ছিলো জন শূন্য । সরকার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দল রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিলো । এ সত্ত্বেও ৩ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ৬০ শতাংশের বেশী ভোটার নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছেন।[৩] ভোট বিহীন প্রহসনমূলক নির্বাচনে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৫১টি, সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) ১৯, ফ্রিডম পার্টি ২, জাসদ (সিরাজ) ৩ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৫টি, আসন লাভ করেছে বলে ঘোষণা করা হয় । এ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৮৮ সালের ২৫ এপ্রিল । উক্ত চতুর্থ জাতীয় সংসদের স্পিকার হন শামসুল হুদা চৌধুরী, ডিপুটি স্পিকার রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, সংসদ নেতা মওদুদ আহমেদ এবং বিরোধী দলের নেতা হলেন আ.স.ম. আবদুর রব । বিরোধী দলগুলো এ সংসদকে ভোটার বিহীন নির্বাচিত সংসদ হিসেবে চিহ্নিত করে ।[৪]

জেনারেল এরশাদ সরকার নির্বাচনে মিডিয়া ক্যু ও ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে । অন্যদিকে তাঁর সরকার বৈধতা অর্জনে ব্যর্থ হন । দেশ-বিদেশের সকল রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতায় রেখে কোন নির্বাচন সম্ভব নয় । আমেরিকান কংগ্রেসম্যান ও এশিয়ান প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব কমিটির চেয়ারম্যান স্টিফেন সোলজও একই অভিমত প্রকাশ করেন যে, " এরশাদ ক্ষমতায় থাকাকালে কোন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয় ।"[৫]

Dhaka University Institutional Repository

৮ দল,৭ দল, ৫ দল,জামায়াতে ইসলামী দল এবং অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ জেনারেল এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান ।[৬] ফলে এরশাদ সরকার বৈধতা অর্জনের সংকট নিরসনে ব্যর্থ হন ।

সারণী - ১

১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের চিত্র

দলের নাম	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৫১	১,৭৬,৮০,১৩৩	৬৮.৪৪
সম্মিলিত বিরোধী দল	১৯	৩২,৬৩,৩৪০	১২.৬৩
জাসদ (সিরাজ)	৩	৩,০৯,৬৬৬	১.২০
ফ্রিডম পার্টি	২	৮,৫০,২৮৪	৩.২৯
স্বতন্ত্র পার্টি	২৫	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৫০
অন্যান্য দল	-	২,৪২,৫৭১	০.৯৪

Source : Government of the People's Republic of Bangladesh, Press Information Department, A Background paper on Bangladesh fifth parliament (Jaitya Sangsad) Elections, handout No. 429, February 20, 1991

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, স্বৈরশাসনের নয় বছর, ১৯৮২-'৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭৭

২. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৮

৩. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩৮

৪. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৬

৫. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬. M. Nazrul Islam, " *Parliamentary Democracy in Bangladesh* An Assessment", Perspectives in Social Science, Vol. 5, University of Dhaka, October, 1998, p.59

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ সংবিধান সংশোধনীসমূহ

সপ্তম সংশোধনী

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকে । ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদ কর্তৃক সপ্তম সংশোধনী বিল পাস হয় । ১১ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভ করে । তা নিম্নে বর্ণিত হলো -

(১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-এই আইন ৭ম সংশোধন আইন ১৯৮৬ নামে অভিহিত করা হয় ।

(২) সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন -

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৯৬ অনুচ্ছেদের (১) দফায় পরিবর্তন করা হয় । এ সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রধান বিচারপতির কার্যকাল বর্ধিত করা । বিচারপতিদের কার্যকাল বাষট্টি থেকে পয়ষট্টি বছর করা হয় ।

(৩) সংবিধানের চতুর্থ তফসীলের সংশোধন -

চতুর্থ তফসীলে,১৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নবর্ণিত নূতন ১৯ অনুচ্ছেদ সংযোজিত করা হয় ঃ

" (১) ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ফরমান, অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদের উক্ত ফরমান বলিয়া উল্লেখিত এবং ১৯৮৬ সালের প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে, অতঃপর যাহা এ অনুচ্ছেদে উক্ত মেয়াদ বলিয়া উল্লেখিত, প্রণীত অন্যান্য সকল ফরমান, ফরমান - আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, সামরিক আইন নির্দেশ, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত এবং বৈধভাবে প্রণীত হয়েছে বলে ঘোষিত হল এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না ।

(২) উক্ত ফরমান বা আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, সামরিক আইন নির্দেশ, অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইন হতে আহরিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বা প্রয়োগ বলে বিবেচনা করে কোন আদালত,

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ বা প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা জন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না ।

(৩) (২) উপ- অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বা প্রণীত কোন আদেশ বা প্রদত্ত দণ্ডাদেশসমূহ কার্যকর বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারার জন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে কোন মামলা, ফৌজদারী কার্যধারা অথবা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলবে না ।

(৪) তৃতীয় তফসিলে উল্লেখিত কোন পদে উক্ত মেয়াদের মধ্যে যে সকল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সেই সকল নিয়োগ বৈধভাবে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না,এবং কোন ব্যক্তি উক্ত মেয়াদের মধ্যে উক্ত ফরমানের অধীন এই প্রকার কোন পদে নিযুক্ত হয়ে থাকলে এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ অতঃপর যাহা এ অনুচ্ছেদে উক্ত আইন বলে উল্লেখিত, প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকলে তিনি উক্ত তারিখ হইতে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছেন; এবং তিনি উক্ত তারিখের পর যথাশীঘ্র সম্ভব যথাযথ ব্যক্তির সম্মুখে তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ বা ঘোষণা পাঠের ফরমে শপথ বা ঘোষণা পাঠ করিবেন এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করবেন ।

(৫) উক্ত মেয়াদের মধ্যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যে সকল পদে নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন সেই সকল পদ যদি উক্ত আইন প্রবর্তনের তারিখের পরেও বহাল থাকে, তা হলে উক্ত তারিখ হতে সেই সকল পদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত বলে গণ্য হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) উক্ত আইন প্রবর্তনের তারিখের পূর্বে বলবৎ সকল অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন, উক্ত ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারকারী ফরমান সাপেক্ষে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত, সংশোধিত বা রহিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বলবৎ থাকবে ।

(৭) উক্ত ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে এই সংবিধান সম্পূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বহাল হবে এবং তা এ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এইরূপ কার্যকর ও সক্রিয় থাকবে যেন উহা কখনও স্থগিত ছিল বা ।

(৮) উক্ত ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারে এমন কোন অধিকার বা সুযোগ পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্বহাল হবে না যা অনুরূপ বাতিল বা প্রত্যাহারের সময়ে বিদ্যমান ছিল না ।

(৯) সংসদের কোন আইন এবং তা' রহিতের ক্ষেত্রে ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট যেরূপ প্রয়োজ্য, উক্ত ফরমান এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে প্রণীত অন্যান্য ফরমান, ফরমান-আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং সামরিক আইন নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে এবং উক্ত ফরমান ও অন্যান্য ফরমান বাতিল করা হয়েছে ।

(১০) এ অনুচ্ছেদে "আইন" বলতে বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ এবং আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য দলিল অন্তর্ভুক্ত ।" [১]

১৯৮৬ সালে ১১ নভেম্বর সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ সরকারের চার বছর আট মাসের সামরিক শাসনকে বৈধ করা হলো । সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সংবিধানকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় ।[২]

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম সংশোধনী

চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অষ্টম সংশোধনী । ১৯৮৮ সালের ১১ মে অষ্টম সংশোধনী জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী বিল সংসদে পাস হয় ।[৩] রাষ্ট্রপতি এ বিলে সম্মতি দান করেন ১৯৮৮ সালের ৯ জুন তারিখে ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো -

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম - এ আইন সংবিধান অষ্টম সংশোধন আইন, ১৯৮৮ নামে অভিহিত করা হয় ।

২। সংবিধানে নূতন ২(ক) অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান - এর ২ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ ২(ক) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে ।

"২(ক) রাষ্ট্রধর্ম - প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে"

৩। সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন ঃ

বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধ - রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারবে না ।

৪। সংবিধানের ৬৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের মাসিক ভাতা যা পূর্বে 'বেতন ' নামে উল্লেখিত ছিলো তার পরিবর্তে 'পারিশ্রমিক' শব্দের প্রতিস্থাপন করা হয় ।

৫। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন নিম্নরূপ করা হয় -

"সুপ্রীম কোর্টের আসন (১)এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে, রাজধানীতে সুপ্রীম কোটের স্থায়ী আসন থাকবে ।

(২) হাইকোট বিভাগ ও তার বিচারকগণ সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসনে এবং বেঞ্চগুলির আসনসমূহে আসন গ্রহণ করবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোহর, রংপুর এবং সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে ।

(৪) প্রত্যেক স্থায়ী বেঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি যেরূপ সংখ্যক হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক মনোনয়নের প্রয়োজন বোধ করবেন সেইরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়া স্থায়ী বেঞ্চটি গঠিত হবে,এবং উক্ত রূপ মনোনয়নের পর মনোনীত বিচারকগণ বেঞ্চটিতে বদলী হয়েছেন বলে গণ্য হবেন ।

(৫) রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে, প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চের পরিধি, কার্যক্রম এবং ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন। অথবা সংবিধানের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ এই সম্পর্কে ক্ষমতা লাভ করবে ।

(৬) প্রধান বিচারপতি স্থায়ী বেঞ্চগুলি সম্পর্কিত সকল আনুষংগিক, সম্পূরক বা অনুবর্তী বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করবেন ।

৬। সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন - সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় "কোন বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হবে" এর পরিবর্তে "সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হবে বা ১০০ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লেখিত হাই কোর্ট বিভাগের কোন স্থায়ী বেঞ্চের কোন বেঞ্চ গঠিত হবে " শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে তা বলা হয়।[৪]

পঞ্চম সংশোধনীতে সর্বকার্যের ভিত্তি হিসেবে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্তা ও বিশ্বাস" কে কে গ্রহণ করা হয় । আর অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয় । ১৯৭৭ সালে সামরিক ফরমান বলে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চতুষ্টয় থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতার বিলোপ এবং সাম্প্রদায়িক দল গঠনের উপর বিধি নিষেধ তুলে নেয়া হলো । ফলে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পাল্টিয়ে যায় ।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

নবম সংশোধনী

চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই নবম সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয় । ১০ জুলাই তারিখে বাংলাদেশের সংবিধানের নবম সংশোধনী বিল পাস হয় । এবং ১১ জুলাই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে । তা নিম্নে বর্ণিত হলো -

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-এ আইন সংবিধানের নবম সংশোধন আইন ১৯৮৯ নামে অভিহিত হয় ।

২। উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন ।

৩। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একত্রে অনুষ্ঠিত হবে ।

৪। একাধিকক্রমে দু'মেয়াদ তথা ১০ বছরের বেশী কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না ।

৫। ৫ বছর পর পর নিয়মিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

৬। রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য সংসদ সদস্যগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংসদ অধিবেশনে বসবেন । এই আইন সংবিধানের ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৮ ও ১৫২ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন সাধন এবং সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করা হয় ।[৬]

৭। ৫১ অনুচ্ছেদকে পরিবর্তন করে ৫১ এবং ৫(ক) দু'টি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি এবং উপ রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ সংশোধন করা হয় । এ পদে থাকাকালীন তাঁরা সংসদ সদস্য হতে পারবেন না । রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হলে উপ-রাষ্ট্রপতিরও মেয়াদ শেষ হবে । তবে উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ।

উল্লেখ্য জেনারেল এরশাদ অবশ্য পরে ঘোষণা করেন যে, তিনি আর একবার রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ।

৮। ৫৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে উপ-রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের ব্যবস্থা করা হলো । এবং ৫৪ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে অসামর্থ্যের কারণে উপ-রাষ্ট্রপতির অপসারণের ব্যবস্থা করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৯। সংবিধানের ৫৫(ক) ধারা প্রণয়ন করে উপ-রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতার সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতির পদে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন । তবে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে ।

১০। ১২৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন একত্রে একই সময় ব্যবস্থা করা হয় । ১৪৮ অনুচ্ছেদের সামান্য সংশোধন করে উপ-রাষ্ট্রপতি যদি কোন কারণে পরে শপথ নিয়ে থাকেন, তবুও রাষ্ট্রপতি যে তারিখে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সে দিন থেকেই পাঁচ বছরের মেয়াদ ধরা হবে ।

১১। ৫৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি পদের সাময়িক শূন্যতা ব্যবস্থা রয়েছে । উপ-রাষ্ট্রপতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথম এরপর স্পীকার ।

১২। ৭২ অনুচ্ছেদে নুতন ৪(ক) দফা সংযোজিত হয়, সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া বা অধিবেশনরত না থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা দেখা দিলে উক্ত সংসদ অধিবেশনে মিলিত হবে । এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ বিধি বিধান প্রণয়ন করবে ।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

দশম সংশোধনী

১৯৯০ সালের ১০ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদের দশম সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয় । ১২ জুনই জেনারেল এরশাদের শাসনামলের সর্বশেষ সংশোধনী পাস হয় । এ বিল ১৯৯০ সালের ২৩ জুন তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে । তা নিম্নে বর্ণিত হলো -

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-এ আইন সংবিধান দশম সংশোধন আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হয়।

২। নবম সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পূর্তির ১৮০ দিন পূর্বে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে । তা নিরসনের জন্য নির্ধারণ করা হয় যে, মেয়াদ পূর্তির ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে ।

৩। ৬৫ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০ টি আসন আরও ১০ বছরের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে ।[৮]

উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে ১০ বছরের জন্য সংসদে মহিলাদের ১৫টি আসন সংরক্ষিত ছিলো । তা ১৯৭৮ সালে ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত এক আদেশের মাধ্যমে ১৫টি আসনের পরিবর্তে ৩০টি আসন নির্ধারিত হয় । এবং ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছর সুনির্দিষ্ট করা হয় ।[৯] পুনরায় ১৯৯০ সালের ১২ জুন সংসদে এ বিলটি গৃহীত হয় ২২৬ ভোটে । বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বিলটির প্রতিবাদে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন ।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৩-২৫৫ । ও দেখুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ১১৫-১১৬

২. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১১৭

৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২২৬

৪. জালাল ফিরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৫৬

৫. ডালেম চন্দ্র বর্মন,"সংবিধান সংশোধনী এবং গণতন্ত্র," সমাজ নিরীক্ষণ/৪২,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৯

৬. আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৭. জালাল ফিরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২৬১

৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১১ জুন, ১৯৯০

৯. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০

১০. The Bangladesh Observer, Dhaka, 13 June, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জেনারেল এরশাদের শাসনামল

১৯৮২-'৯০ সাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জেনারেল এরশাদের নয় বছর সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনামল রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিলো । তিনি ব্যর্থ হয়ে ছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে । তাঁর শাসনকাল ছিলো সহযোগীদের নিন্দনীয় ভূমিকা, স্বেচ্ছাচারিতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সন্ত্রাস, আমলাদের অসহযোগিতা, নির্বাচনে কারচুপি, অর্থ আত্মসাত ও পরনির্ভরশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেউলিয়ায় পরিণত করেছিলো । তখন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্যে অনেক দাতা দেশ সাহায্য বন্ধ করে দেয় । ফলশ্রুতিতে দেশে মারাত্মক অর্থ সংকট দেখা দেয় । তখন জাতীয় জীবন পরিণত হয় দুর্নীতির আখড়ায় । তাঁর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে । তিনি গণতন্ত্র চর্চার সকল পথ বন্ধ করে স্বৈরতন্ত্রের রূপ ধারণ করেন । যার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকট কাটাইয়া উঠতে সক্ষম হননি ।

যদিও তিনি বেসামরিকীকরণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তা-তে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির অংশীদারিত্বের অভাব ও রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় নাগরিকদের মধ্যে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় । এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দেয় । তা ছাড়াও তাঁর উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা জনগণের জন্যে তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেননি । পরিশেষে গ্লানি ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে ।

উক্ত সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে উঠতে বিলম্ব হওয়ায় জেনারেল এরশাদ দীর্ঘ নয় বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা

বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের এক গৌরবময় ইতিহাস । এ ইতিহাস সামনে রেখে এদেশের ছাত্র-জনতা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরীক হন । এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসের ৮ তারিখ ক্লাসরত একজন শিক্ষককে পুলিশ প্রহার করার পর দল মত নির্বিশেষে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এ ঘটনার প্রতিবাদে সামরিক আইন ভেঙ্গে মিছিল ও সভা করে ।[১]

ছাত্ররা এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে । মজিদ খানের শিক্ষানীতিকে অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেন । ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষানীতি কেন্দ্রিক আন্দোলনকে, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার আন্দোলনে রূপান্তরিত করে । ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হওয়ার পর আন্দোলন বেগবান লাভ করে ।[২] এ সময়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠিত হয় । আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট এবং বি.এন.পি. প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট । ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখ রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং ১৯৮৪ সালের ২৪মে এবং ১৫ নভেম্বর যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় । রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় ধরনের সরকার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোটের মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি হলো । ১৫ দলীয় জোট সংসদীয় ধরনের সরকার ব্যবস্থার দাবী করে, অপরদিকে ৭ দলীয় জোট রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার দাবী করে । উভয় জোট সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্যে পাঁচ দফা কর্মসূচির প্রতি ঐক্যমত পোষণ করে । পাঁচ দফা দাবী ছিল মূলত ঃ সামরিক আইন প্রত্যাহার ও মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সর্বাগ্রে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন, সংবিধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নির্বাচিত সংসদের হাতে অর্পন এবং অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দান ।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল এরশাদ সরকার আন্দোলন প্রশমনের জন্য বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতায় আসার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে সরকার ৮ ও ৭ দলীয় জোটের সাথে সংলাপে বসে । কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয় । এরশাদ সরকার ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করেন । বিরোধী দল তা প্রত্যাখান করে । সরকার ১ মার্চ থেকে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করে । এ সময় গণভোট ও উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ১৯৮৬ সালের মে মাসে আবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় । ১৫ দল এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে । জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার প্রশ্নে, বিরোধের ফলে ১৫ দল থেকে বামপন্থি ৫ টি দল বেরিয়ে আসে । এবং ৭ দলীয় জোট নির্বাচন প্রত্যাখান করে । ১৯৮৬ সালের এ নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ সরকার ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু আশ্রয় গ্রহণ করে । সংসদ নির্বাচনের পর তিনি একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । (পরিশিষ্ট - ২ দ্রষ্টব্য) কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি বিরোধী দল । সংসদ নির্বাচনের পর তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করেন । অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন এবং হরতাল পালন করে । নির্বাচনে জনগণ ভোট কেন্দ্রে যায়নি, তাঁর পরও জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন । বিরোধী দল ১৯৮৭ সালের গণবিরোধী বাজেট ও জেলা পরিষদ বিল প্রভৃতি সরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতর ও বাহিরের আন্দোলনকে জোরদার করতে সক্ষম হয় । এ সময় ৭ দলীয় ও ৫ দলীয় জোট আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে । ১৯৮৭ সালের জুন-জুলাই মাসে নুতন করে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটে । তা পরবর্তীতে এক দফা দাবীতে পরিণত হয় । এ একদফা দাবী হলো জেনারেল এরশাদ সরকারের পদত্যাগ । আন্দোলনের শুরুতে দু'জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার যুক্ত বিবৃতিতে মুক্তি যুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অঙ্গিকার জনগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো ।[৪]

১৯৮৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ৮,৭, ৫ দল, জামাত এবং ২২ টি ছাত্র সংগঠনের আহ্বানে এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় । এ দিন ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয় । ২ মার্চ ৩ জোটের লিয়াজোঁ কমিটি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান - দেশ ও জাতির

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে হবে । লিয়াজোঁ কমিটি এক বিবৃতিতে বেতার টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক-পাঠিকা, ঘোষক-ঘোষিকা ও কলা-কুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান জেনারেল এরশাদ সরকারকে সহযোগিতা না করার জন্য ।[৫]

কিন্তু ১৯৮৮ ও '৮৯ সালে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি দিতে ব্যর্থ হয় । তখন রাজনীতি স্থবির হয়ে পড়ে । ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বি. এন.পি.সহ প্রধান বিরোধী দলগুলোর অংশ গ্রহণ ছাড়াই প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । জাসদ (রব) 'অনুগত বিরোধী দল' হিসেবে জেনারেল এরশাদ সরকারকে সহযোগিতা করেন ।[৬]

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেও বি.এন.পি. সহ মূল বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করে । তাঁরা এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে । ১৯৮৭ সালের আন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেংঙ্গে দিয়ে ১৯৮৮ সালে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন ।[৭] উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি. এবং জামাত সহ অধিকাংশ দল নির্বাচন বর্জন করে । শুধুমাত্র জাসদ রবের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী দল, জাসদ (সিরাজ) ও ফ্রিডম পার্টি নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় । কিন্তু দ্বন্দ্বের কারণে সরকার বিরোধী আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে । পরবর্তীতে ছাত্ররাই আন্দোলনের সোপান তৈরী করে । ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্র সংগঠন নিয়ে গড়ে ওঠে " সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ " । এ গণআন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি ছিলো সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য । ছাত্ররা ঐক্য হওয়াতে রাজনৈতিক দলগুলোও একই সাথে আন্দোলনে যোগ দেয় । তা ছাড়া এ আন্দোলনে শিল্পি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী এবং সরকারী কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করে । ফলে তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয় ।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মোঃ নূরুল আমিন, "এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ঃ একটি পর্যালোচনা", রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ৬৯-৭০

২. আবুল ফজল হক, "বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও দলীয় রাজনীতি ১৯৭৫-৮৬," রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬০

৩. B.M. Monoar Kabir, "*Movement and Election : Legitimisation of the Military Rule in Bangladesh*," *Journal of Political Science Association*, 1988, p. 174.

৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পাঃ), নব্বই-এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২২-২৩

৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), গণআন্দোলন ১৯৮২-'৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.৬৩ ও ৬৭

৬. আশরাফ কায়সার , বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১১৭

৭. Lawrence Ziring, *Bangladesh From Mujib to Ershad And Inter pretive Study*, University Press Ltd. Dhaka, 1992, pp.208-209.

৮. জাওয়াদুল করিম, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ তিন জোটের রূপরেখা ও '৯০ গণঅভ্যুত্থান

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী । এ অভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে । অতীতে দেখা যায় যে, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খানের পতন হলেও গণতন্ত্রের শুভ সূচনা হয়নি বরং আর এক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় । কিন্তু '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান বিভিন্ন দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত । এ আন্দোলনে রাজনীতির বিজয় সূচিত হয়েছে । অতীতে এমনটি হয়নি । এ বারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়েছিলো । এ গণআন্দোলনের রূপরেখা ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির, বিরোধী দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো ।[১]

১৯৯০ এর গণআন্দোলন বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে - সামাজিক নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং তাঁর সহযোগীদের নিন্দনীয় ভূমিকা আন্দোলনের অন্যতম কারণ । তা ছাড়া দুর্নীতিকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ফলে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসীনদের নগ্নতা নীতিবোধকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো ।[২]

জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করার পরই তাঁর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় । তিনি ১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করেন । তাতে আওয়ামী, জামাত, ন্যাপ ও কম্যুউনিষ্ট পার্টিসহ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন । নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হলেও এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন প্রশমিত হয়নি । বি.এন.পি.সহ মূল বিরোধী দল এ নির্বাচন বর্জন করেছিল । তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তুলে ।[৩]

১৯৯০ সালের ১০ জানুয়ারি ৯টি ছাত্র সংগঠন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য প্রচারের দাবীতে বাংলাদেশ রেডিও টেলিভিশন ভবন সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে । ৪ ফেব্রুয়ারি ৭ ও ৫

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারাদেশে উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয় । ১৯৯০ সালের ২৮ জুন এরশাদ সরকারের ঘোষিত বাজেটের প্রতিবাদে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় । ১২ জুলাই তারিখে জেনারেল এরশাদ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংলাপে বসার প্রস্তাব করেন । কিন্তু ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট ১৩ জুলাই এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে । ৩১ আগস্ট সরকার মেজর জেনারেল নুরুদ্দিনকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করেন । অন্য দিকে দেশের -পত্র-পত্রিকায় আহ্বান জানানো হয় ৮ ও ৭ দলীয় জোটের নেত্রীকে একই মঞ্চে যৌথভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য । '৯০ এর সেপ্টেম্বর মাসে 'ডাকসুর' উদ্যোগে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় । এ কনভেনশনে এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হলে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে । অতঃপর 'ডাকসুর' ভি.পি. আমানুল্লাহ আমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্ব দলীয় ছাত্রঐক্য পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব করা হয় ।[৪]

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর ছিলো ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি । এ ঘেরাও কর্মসূচিতে সচিবালয় ও মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় পুলিশ ছাত্র-জনতা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর লাঠিচার্জ, কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করে । বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাও পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুড়ে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসের গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে । কয়েক ঘণ্টা ধরে পুলিশ ও জনতার মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলতে থাকে । এ সময় পুলিশের গুলিতে উল্লাপাড়া কলেজের ছাত্র জেহাদসহ ৫ জনের মৃত্যু হয় । ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ' সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' গঠিত হয় । ঐ দিন জেহাদের লাশ সামনে রেখেই ছাত্ররা শপথ নিয়েছিলো । তখন 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের' ২২টি ছাত্র সংগঠন জেহাদের লাশ সামনে রেখে বলেন, " স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত না করা পর্যন্ত এ ঐক্য বজায় থাকবে" । ১১ অক্টোবর ছিলো ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহবানে দেশব্যাপী সকাল- সন্ধ্যা হরতাল । এ দিন সকাল ১১ টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্যাম্পাস থেকে মিছিল সহকারে শাহবাগ চৌরাস্তার মোড়ে পৌছলে, পুলিশের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হন ডাকসুর ভি.পি. আমানউল্লাহ আমান, জি.এস. খায়রুল কবীর খোকন, এ.জি.এস. নাজিমুদ্দিন আলম, ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

হাবিবুর রহমান হাবিব ও ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধানসহ বহু ছাত্র নেতা ও কর্মী আহত হয় ।[৫]

১৯৯০ সালের ১৩ অক্টোবর ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র মুনির । নিহত মুনিরের লাশ ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের চত্বরে নিয়ে আসে । এ সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার ছাত্র-জনতা উপস্থিত হয় । তাঁর লাশ নিয়ে শপথ নেয়ার পর জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ শোকমিছিল কার্জন হলের পাশ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় পুলিশ বাধাপ্রদান করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয় । এর পর প্রায় সারাদিন সংঘর্ষ চলে । দুপুর সোয়া দু'টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল করে মনিরুজ্জামান মনিরের লাশ অপরাজয় বাংলার পাদদেশে নিয়ে এলে প্রতিবাদ সভা শুরু হয় । 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' এ সভায় উপস্থিত হন শেখ হাসিনা, আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, মাজেদুল হক, রাশেদ খান মেনন, শামসুল হক চৌধুরী, হাসানুল হক ইনু, নির্মল সেন, আবদুল মতিন চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত প্রমুখ । শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে বলেন, যেকোন মূল্যে ছাত্রদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান । তিনি সকলের দাবির মুখে পরের দিন ছাত্র ধর্মঘট এবং ১৫ অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল ঘোষণা দেন । তখন শপথবাণী পাঠ শেষে 'জয় বাংলা' ' জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিলে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । পাল্টা শ্লোগান আসে ঐক্য চাই-ঐক্য চাই । সে সময় উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি শান্ত করতে সামর্থ হন । পরে মনিরের লাশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় ।[৬] ছাত্রদের আন্দোলনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এরশাদ সরকার ১৩ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে ।[৭]

400827

১৯৯০ সালের ১৫ অক্টোবর ঢাকায় 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের' আহ্বানে অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হয় । ১৬ অক্টোবর এরশাদ সরকারের পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারাদেশে সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় । এই দিন বিকালে ঢাকায় ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা ঐক্য ভাঙ্গার সাধ্য কারও নেই । অপর দিকে ৭ দলীয় ঐক্য জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক সমাবেশে সর্বস্তরের জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"এরশাদ সরকারের উৎখাতের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন " । ১৭ অক্টোবর সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে । ২০ অক্টোবর পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি. চত্বরে ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে ২৫ জনেরও বেশী ছাত্র ও নাট্য কর্মীদের গ্রেফতার করা হয় ।[৭] ২২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নুতন আইনের বিরুদ্ধে হুশিয়ার উচ্চারণ করা হয় । এ সমাবেশে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক আহ্বান জানান, এরশাদ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চালিয়ে যাবার ।[৮]

২৩ অক্টোবর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয় । ২৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোট বেঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আদালতে আবেদন পেশ করা হয় । আদালত এ ব্যাপারে সরকারের উপর কারণ দর্শানোর রুলনিশি জারি করে। ৩০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক সভায় অলিম্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবি ঘোষণা করে ।[৯] সরকার বিরোধী আন্দোলনকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে জেনারেল এরশাদ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন । ভারতের 'বাবরি মসজিদ' ইস্যুকে কেন্দ্র করে, দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় । তখন তাঁর গুণ্ডা বাহিনী ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আক্রমণ ও তাদের ঘর-বাড়ি দোকান-পাট লুট করে । এ অজুহাতে সরকার ৩১ অক্টোবর ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কার্ফু জারি করে । 'সর্ব দলীয় ছাত্রঐক্য' সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে শান্তি মিছিল বের করে ।[১০]

১৯৯০ সালের ৬ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চ সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত নুতন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে রীট শুনানী শুরু হয় । ৮ নভেনম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে 'সর্বদলীয় ছাত্র' ঐক্যের' একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল প্রেসিডেন্টের সচিবালয় অভিমুখে যাওয়ার সময় গ্রীণরোড-পান্থপথ মোড়ে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয় । ফলে দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার উত্তেজনা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে । ১০ নভেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় । ১১ নভেম্বর সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয় । ১৬ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস চত্বরে অনুষ্ঠিত 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' সভায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা আমানউল্লাহ আমান এবং ছাত্রলীগের নেতা হাবিবুর রহমান হাবিবকে এক সভামঞ্চে উপস্থিত দেখে ছাত্র-জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে । এ সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, "জেহাদ-মনিরের লাশ ছুয়ে আমরা শপথ নিয়েছি এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবো না ।" [১১]

আন্দোলনরত তিন দলীয় জোট জেনারেল এরশাদ সরকারকে উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন করেন । এ রূপরেখা নিম্নরূপ -

" (১) হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তাঁর সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ঃ (ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছের ক(৩) ধারা এবং ৫৫ অনুচ্ছেদের ক(১) ধারা এবং ৫১ অনুচ্ছদের ৩ নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তাঁর সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে । বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করতঃ রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন । (খ) এ পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ, নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা ।

(২)-(ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি , উপরাষ্ট্রপতি বা সংসদ পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না । তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না । (খ) অন্তবর্তীকালীন এ সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনবিন্যাস করবেন । (গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে । (ঘ) গণ-প্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার- প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে ।

(৩) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এই সাংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে ।

(৪)-(ক) জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরংকুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে । নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোন পন্থায়, কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না । (খ) জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা । এবং (গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করতে হবে ।" [১২]

১৯৯০ সালের নভেম্বর মাস থেকেই এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন নুতন মাত্রা লাভ করে । এর মূলে ছিলো তিন জোট । ১৯ নভেম্বর সংবিধানের আওতায় জেনারেল এরশাদ ও তাঁর সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় । যা ' তিন জোটের রূপরেখা' নামে অবিহিত করা হয়েছে । ১৭ নভেম্বর ছাত্ররা মন্ত্রী পাড়া ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে । তাঁরা মন্ত্রীদের 'গণ দুশমন' বলে আখ্যায়িত করেন । ২৭ নভেম্বর দেশব্যাপী চিকিৎসক ধর্মঘটের দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি. মোড়ে নিহত হন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ডা. শামসুল আলম মিলন । এ সংবাদে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে । রাত সাড়ে দশটায় সরকার সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঢাকা শহরে কার্ফু জারি করা হয় । ছাত্র-জনতা এসব উপেক্ষা করে

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলে ।২৯ নভেম্বর ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে উপাচার্যসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক একযোগে আন্দোলনের সমর্থনে পদত্যাগ করেন । এরপর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ আন্দোলনের সমর্থনে পদত্যাগের ঘোষণা দেন । সংঘঠিত হয় '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান । অতঃপর ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন । ফলে দীর্ঘ নয় বছর এরশাদ শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে ।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. See Arun Kumar Goswami, "*The Grits of Democratisation in Bangladesh*", *in Bangladesh Political Science Review*, Vol. 1, No. 1, 2000, Department of Political Science, University of Dhaka, pp. 84-92.

২. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, শেখ মো. ইসমাইল হোসেন, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫৪-৫৫

৩. M. Nazrul Islam, "*Parliamentary Democracy in Bangladedsh An Assessment*", *Perspectives in Social Science*, Vol. 5, University of Dhaka, 1998, p. 59.

৪. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

৫. দেখুন সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৯বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৮ অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৮ ও ১১-১২

৬. দেখুন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৪-১৬ অক্টোবর, ১৯৯০

৭. সাপ্তাহিক ছুটি, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪০, ১৯ অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১

৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৬৮

৯. দেখুন দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৪-২৫ অক্টোবর, ১ নভেম্বর, ১৯৯০

১০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পাঃ), নব্বই-এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৩০

১১. দেখুন দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৭, ১১-১৭ নভেম্বর, ১৯৯০

১২. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৪৯-৩৫০

১৩. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউএজ পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ এরশাদ সরকারের পতন

জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের শাসনামলের কাল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হয় । এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক, বেতার-টেলিভিশন শিল্পী, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণীর জনগণ অংশগ্রহণ করেন । রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এরশাদ সরকার বিরোধী জোট গঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ দলীয় ঐক্যজোট, বি এন পির নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, ১৭ টি কৃষক সংগঠন এবং আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে প্রণীত হয় ১৫ দল ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের যৌথ ৫ দফা কর্মসূচি । এর ভিত্তিতে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে ওঠে । ৫ দফার মূল দাবি ছিল ঃ অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে । রাজনৈতিক দল ও জোটের ডাকে শুরু হয় অর্ধ দিবস, পূর্ণ দিবস, ২৪ ঘণ্টা, ৩৬ ঘণ্টা, ৭২ ঘণ্টার হরতাল ও অবরোধ । ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর জিরো পয়েন্টে পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন নিহত হয় ।[১]

১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এ নির্বাচন দেশের প্রধান বিরোধী দলগুলো বর্জন করে । ৩ মার্চের সংসদ নির্বাচনে অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচন সম্ভব নয় । ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোটসহ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করে ।[২] উক্ত জোটগুলো নির্বাচন বয়কট করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান । এবং ৩ মার্চ সকাল ৬ টা থেকে বিরতিহীন ৩৬ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয় । ফলে ভোট কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য ছিলো ।[৩]

১৯৮৯ সালের ১৭ ও ১৮ অক্টোবর শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে ৪৮ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয় । ১ নভেম্বর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বেগম খালেদা জিয়া প্রতীক

Dhaka University Institutional Repository

অনশন পালন করেন । ৫ নভেম্বর ৭ দলীয় জোটের আহ্বানে দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় ।[৪] ১১ নভেম্বর ৭ দলীয় জোট এককভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে । উক্ত ঘোষণায় ২০ নভেম্বর সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ২৮ নভেম্বর সচিবালয় অবস্থান ধর্মঘটের আহ্বান করা হয় । ২১ নভেম্বর জাতীয় পার্টি আয়োজন করে এক 'হরতাল বিরোধী' মিছিল । জেনারেল এরশাদও এ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন ।[৫]

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর ৮, ৭, ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হয় এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন । ঐ দিন এক জনসভায় তিনি বলেন, "অবরোধ করে সরকার পরিবর্তন করা যায়না, হরতালে সরকারের পরিবর্তন হয় না ।" মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই গণআন্দোলন রূপ ধারণ করে গণঅভ্যুত্থানে । ফলে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন । তাঁর শাসনামলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের শিক্ষাঙ্গণ, বিচার বিভাগ এবং পদদলিত হয় সাংস্কৃতিক অঙ্গন । আর এ শিক্ষাঙ্গণ থেকেই সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে । তার পরিসমাপ্তি হয় ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে । ১০ অক্টোবর সচিবালয় অবরোধে পাঁচ জনের মৃত্যু ও শতাধিক আহত হন । এ দিন বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপরাজেয় বাংলার' সামনে ছাত্র নেতারা জেহাদের লাশ সামনে রেখে শপথ নিয়ে ছিলো ঃ "এরশাদকে না হটিয়ে আমরা ঘরে ফিরবো না । স্বৈরাচারের পতন না ঘটিয়ে ক্লাসে ঢুকবো না" । ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যবসাজীবী ও সংস্কৃতি কর্মী আন্দোলনের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করে । ২৭ অক্টোবর সারাদেশে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয় । ৬ নভেম্বর সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী জোট ও দল বিক্ষোভ সমাবেশ করে । ৮ নভেম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নুতন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে " সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের" একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পালিত হয় । ঐ দিন পুলিশের সঙ্গে ' সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ, ভাংচুর ও বোমাবাজি হয় । ১০ নভেম্বর সরকারের অপসারণ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সংসদ বাতিলের দাবিতে বিরোধী জোটগুলোর আহ্বানে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় । ২০ ও ২১ নভেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালের ১৭ নভেম্বর ' সর্ব দলীয় ছাত্র ঐক্যের' 'গণ দুশমন প্রতিরোধ দিবস' পালন ও মন্ত্রিপাড়া ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় । ফলে ' গণ দুশমন' বিরোধী কর্মসূচি আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে । দু'মন্ত্রির উপস্থিতিতে জাতীয় 'যুব সংহতির' সমাবেশ থেকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণ করে । ১৮ নভেম্বর ' সশস্ত্র বাহিনী' দিবসের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য তিন জোট ২১ নভেম্বরের হরতাল কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয় । ১৯ নভেম্বর তিন জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে । ২০ নভেম্বর দেশব্যাপী বিরোধী জোটের ২৪ ঘণ্টা হরতালে ১ জন নিহত, কয়েকশত আহত এবং ৫০ জনের বেশী গ্রেফতার করা হয় । ২১ নভেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে । ২২ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে গুলিবর্ষন করা হয় । ২৩ নভেম্বর যুবদল নেতা মির্জা আব্বাসকে মিছিল থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে । ঐদিন ছাত্রদল নেতা নীরুকে ছাত্রদল থেকে বহিস্কার করা হয় । ২৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক ও বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে ৭ জন গুলিবিদ্ধ হন । ঐ দিনই গোলাম ফারুক অভিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল থেকে বহিস্কার করা হয় । ২৭ নভেম্বর ভোরে যুবলীগ নেতা মোস্তফা মহসিন মন্টুকে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের অভিযানের মুখে 'নীরু - অভি বাহিনী কৌশলগত কারণে অবস্থান নেয় দোয়েল চত্বর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বাংলা একাডেমী এলাকায় । তখন আনুমানিক সকাল ১০ টা টি . এস.সি'র সড়ক দ্বীপের কাছে সরকার সমর্থকদের গুলিতে বি.এম. এ-এর যুগ্ম সম্পাদক ডা. শামসুল আলম মিলন নিহত হন । এ সংবাদ শুনার সাথে সাথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সকল শিক্ষক এবং চিকিৎসক একযোগে পদত্যাগ ঘোষণা দেন । তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । মৃত্যুর খবরে হাজার জনতা মিছিল সহকারে রাজপথে নেমে আসে । অপরদিকে রাতে জেনারেল এরশাদ এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন । সেই সাথে তিনি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন । জনগণ ক্রোধে জ্বলে ওঠে, ছাত্র-জনতা ২৮ নভেম্বর জরুরী অবস্থা লংঘন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বিশাল লাঠি মিছিল সহকারে রাস্তায় বেরিয়ে আসে । রাজপথ লাখ লাখ জনতার মিছিলে কম্পিত হয় । ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক যৌথ সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেন ।[৭] এ গণআন্দোলন রূপ লাভ করে গণঅভ্যুত্থানে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালের ৩০ নভেম্বর জুম্মার নামাজের পর শহীদদের স্মরণে গায়েবানা জানাজার জন্য বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গনে মুসল্লীরা সমবেত হন । গায়েবানা জানাজা শেষে মিছিল বের হয় । জনতার এ মিছিলটি কাকরাইল মোড়ে পৌছলে পুলিশ গুলি বর্ষন করে ছত্রভঙ্গ করে দেয় । এদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ' সম্মিলিত সাংস্কৃতি জোট' এক সমাবেশের আয়োজন করে । এ সময় জেনারেল এরশাদকে পদত্যাগের আহ্বান জানান সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি বেগম সুফিয়া কামাল । ঐ দিন চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশালসহ অন্যান্য শহরে জনতা গায়েবানা জানাজা শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে । ১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তিন দলীয় জোট এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় । ঐ দিন জরুরী অবস্থা ও কার্ফু উপেক্ষা করে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবী, ছাত্র-শ্রমিক-জনতা রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ করে । ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মিছিলের উপর সরকারী বাহিনীর গুলিতে ৮ জন নিহত এবং বহু আহত হয় । তা ছাড়া চট্টগ্রামে কালুরঘাট, নারায়নগঞ্জের মওলপাড়া ও খুলনায় বিক্ষুব্ধ জনতার উপর নির্মমভাবে গুলি বর্ষন করে । তখন বহুজন গুলিবিদ্ধ এবং গ্রেফতার হয় । দেশের অন্যান্য শহর ও গঞ্জে শ্রমিক-জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করে । সরকারী বাহিনী এসব মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ ও গুলি বর্ষন করে । (এই সময়ের বিলিকৃত বুলেটিন পরিশিষ্ট- ৩ দ্রষ্টব্য) । এ পরিস্থিতিতে এরশাদ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. এম. এ. মতিন ও অপর ৩ জন মন্ত্রীসহ ১৯ জন সংসদ সদস্য একযোগে পদত্যাগ করে ।[৮]

২ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে ' সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের' এক সমাবেশে টেলিভিশন সংবাদ পাঠক ও ঘোষকদের একটি কাল তালিকা ঘোষণা করা হয় । এই দিন সরকার ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাতকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নুতন মেয়র নিযুক্ত করেন । ড. কামাল হোসেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত আইনজীবীদের এক সমাবেশে এরশাদ সরকারকে ' অবৈধ ও খুনী' ঘোষণা করেন । আইনজীবীগণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য আদালত বর্জনের ঘোষণা দেন ।[৯]

৩ ডিসেম্বর (১৯৯০) ছিলো তিন দলীয় ঐক্যজোট এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল । হাজার হাজার নেতা-কর্মী, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভ মিছিল সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে । এ দিন বি.সি.এস. ক্যাডারের ২০৫ জন সদস্য পদত্যাগের ঘোষণা দেন । ব্যারিস্টার মওদুদ

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ, ব্যরিস্টার আবুল হাসনাত, ব্যারিস্টার রাবেয়া ভুঁইয়া এবং আইন মন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম ভুঁইয়ার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিরসদস্য পদ বাতিল ঘোষণা করেন । ৫৮ টি এন. জি. ও সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে । জাতিসংঘের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জাতিসংঘের সকল কার্যক্রম ও দফতর বন্ধ ঘোষণা করা হয় । চট্টগ্রামে সরকারী বাহিনীর গুলিতে ১ জন নিহত এবং চাঁদপুরেও গুলিতে ১ জন নিহত হন । এ ঘটনার প্রতিবাদে চাঁদপুরের ডেপুটি কমিশনার পদত্যাগ ঘোষণা করেন । জেনারেল এরশাদ রাতে এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৫ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তেফা দেওয়ার ঘোষণা দেন । তিন দলীয় ঐক্যজোট এবং 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন ।[১০]

৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই লাখ লাখ জনতা এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী বিক্ষোভ মিছিল সহকারে রাজপথে নেমে আসে । প্রেসক্লাবের সামনে বিভিন্ন সংগঠনের অবিরাম অবস্থান শুরু হয় । জনতা জেনারেল এরশাদের কুশপুত্তলিকা ও ছবি অগ্নিসংযোগ করে । বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সমন্বয় পরিষদের সদস্যরা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীরা সচিবালয় থেকে বেড়িয়ে আসে । তিন দলীয় জোট ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য জেনারেল এরশাদের পূর্বের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে পদত্যাগের দাবিতে অটল থাকে ।[১১]

জেনারেল এরশাদের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় খালেদা জিয়া বলেন, সকল রাজনৈতিক দল মিলে আমরা একটা রূপরেখা দিয়েছি । এই রূপরেখা অনুযায়ী আমাদের দাবি অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে । ডঃ কামাল হোসেন বলেন, এখানে মূল দাবি হচ্ছে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং অন্তবর্তকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

শেখ হাসিনা গৃহবন্দী অবস্থা থেকে তিনি তাঁর দলের যুগ্ম সচিবের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ভাষণের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ VAGUE, জনগণের মনে ভ্রান্তি সৃষ্টি করার নুতন চাল মাত্র । আমাদের দাবি এরশাদ সরকারের অপসারণ, অন্তবর্তীকালীন নির্দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। তা- না হলে আন্দোলনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে ।

৫ দলীয় জোটের রাশেদ খান মেনন প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমরা যে রূপরেখা দিয়েছি তার সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ নয় । কারণ আমাদের প্রথম ও প্রধান দাবি হচ্ছে তাকে পদত্যাগ করতে হবে তিনি যে প্রস্তাব রেখেছেন তাতে তিনি ক্ষমতায় থাকার সময়টা বাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন ।[১২]

৪ ডিসেম্বরই রাত ১০ টার সংবাদের শেষে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় । এ সংবাদের সাথে সাথে কার্ফু উপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে লাখ লাখ জনতা আনন্দ ও উল্লাসে রাজপথে বেরিয়ে পড়ে ।[১৩] সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ড. কামাল হোসেন গভীর রাতে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ঐক্যবদ্ধ জনতার সামনে কোন শক্তি টিকে থাকতে পারে না তা প্রমাণিত হলো । অন্য দিকে 'সর্ব দলীয় ছাত্র ঐক্যের' পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত ঘোষণাসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয় ঃ

"১। অবৈধ ক্ষমতা দখল ও দুর্নীতির অভিযোগে অবিলম্বে এরশাদকে গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে ।

২। গত ৯ ডিসেম্বর গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যে সমস্ত বীর শহীদরা আত্মদান করেছেন তাদের সকলকে অবিলম্বে জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান করতে হবে এবং ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে শহীদ পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোষণা দিতে হবে ।

৩। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রনেতা বজলুর রশীদ ফিরোজসহ সকল ছাত্র যুব রাজবন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করতে হবে । গত ৯ বছর সামরিক শাসন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে যে সমস্ত ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীকে সামরিক আদালতসহ অন্য কোন আইনে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে, তাদের দণ্ডাদেশ বাতিল করতে হবে ।

৪। সকল দুর্নীতিবাজ এম.পি, দালাল রাজনীতিবিদ, লুটেরা ব্যবসায়ী ও আমলাদের অবৈধ পন্থায় অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। গত ৯ বছর যারা অবৈধ স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে এবং আন্দোলনরত জনতার উপর গুলি ও নির্যাতন চালিয়েছে তাদের তালিকা প্রণয়ন ও অবিলম্বে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৬। মওদুদ আহমেদ, কাজী জাফর আহমেদ, শাহ মোয়াজ্জেম, মাওলানা এম.এ. মান্নান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, নাজিউর রহমান মঞ্জু, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জিয়াউদ্দিন বাবলু, আবুল হাসনাত, জাফর ইমাম, শেখ শহীদুল ইসলাম, সিরাজুল হোসেন খান, আ.স.ম. আবদুর রব, সরকার আমজাদ, রুহুল আমীন হাওলাদার, মোস্তফা জামাল হায়দার, এ. বি. এম. গোলাম মোস্তফা, খালেদুর রহমান টিটো, মাহমুদুল হাসান, মাহমুদুর রহমান, তাজুল ইসলাম, ডাঃ আজিজুর রহমান, গাফফার, নুরুন্নবী চাঁদ, ডাঃ মতিন, কাজী ফিরোজ রশিদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মঞ্জুর কাদের, এদের গণদুশমন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মাটিতে এদের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।

৭। খুনী স্বৈরাচারী এরশাদের নামে নামাঙ্কিত সকল প্রতিষ্ঠানের নাম ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাহার করে নিতে হবে । এর পরিবর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদদের নামে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পুনঃনির্ধারণ করতে হবে । জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এরশাদ হলের নাম এখন থেকে শহীদ ডাঃ মিলন হল নাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । এরশাদ আর্মি স্টেডিয়ামের নাম মুক্তিযোদ্ধা স্টেডিয়াম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । মহাখালী বাজারের এরশাদ গেটের নাম এখন থেকে শহীদ মনিরুজ্জামান মনির এবং যাত্রাবাড়ি এরশাদ গেট শহীদ জেহাদ গেট ঘোষণা করা হয়েছে ।

৮। এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তির প্রতি আহ্বান ঃ দালালী রাজনীতি চির অবসানের লক্ষ্যে আজ থেকে স্বৈরাচারী খুনি এরশাদের সরকারের সহযোগীদের কোন অবস্থাতেই তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া যাবে না ।

৯। ছাত্র, যুবক, মহিলা, কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক ক্ষেতমজুর, আইনজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংস্কৃতিক সেবী, শিক্ষক বিভিন্ন স্তরের পেশার মানুষের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত ন্যায় সঙ্গত দাবিসমূহকে বাস্তবায়িত করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

১০। অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট, জরুরী আইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ (৯০) সহ সকল কালাকানুন বাতিলের ঘোষণা দিতে হবে ।

১১। দেশের বুকে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনায় যে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে উঠেছে তাকে সমুন্নত রেখে গণতান্ত্রিক দেশ-প্রেমিক শক্তিকে একযোগে জনগণের আকাঙ্খা পূরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে ।

১২। মতিঝিলের আল্লাওয়ালা ভবনকে এখন থেকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি যাদুঘর হিসেবে ঘোষণা করছি ।

১৩। আগামীকাল থেকেই সকল বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিতে হবে ।"[১৪]

৫ ডিসেম্বর তিন দলীয় ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামী দল সর্বসম্মতক্রমে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেন । এদিনই জেনারেল এরশাদ চতুর্থ জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন । এ সময় খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা রেডিও এবং টেলিভিশনে এক ভাষণে দেশের জনগণকে শান্ত থাকার জন্যে আহ্বান জানান । (পরিশিষ্ট - ৪ দ্রষ্টব্য) । ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন । বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন । জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন । অবসান ঘটে এরশাদ সরকারের নয় বছর স্বৈরশাসনের ।[১৫] বিজয় সূচিত হয় সংগ্রামী জনতার ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬

2. Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, University Press Ltd, Dhaka, 1993, p. 29.

৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৪ মার্চ, ১৯৮৮ ।

৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৩২-১৩৩ ।

৫. দেখুন দৈনিক খবর, ঢাকা, ১২-২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ ।

৬. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, শেখ মো. ইসমাইল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬১ - ৬৬ ।

৭. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৬২-১৬৩ ।

৮. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫৪ ।

৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১ ।

১০. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত ,পৃ. ৩৫৫ ।

১১ .আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৭৬ ।

১২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পাঃ), নব্বুই-এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৬১-৬২ ।

১৩. এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ ।

১৪. মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫ ।

১৫. Talukder Moniruzzaman, *Politics and Security of Bangladesh*, University Press Ltd. Dhaka, 1994, p. 143.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ জেনারেল এরশাদের শাসনকাল ঃ পর্যালোচনা

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর তিনি বৈধতা সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য চেষ্টা করেন । কিন্তু ক্ষমতা দখলের পরই জন মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় । তাঁর দীর্ঘ নয় বছরের দুর্নীতি,স্বেচ্ছাচারিতা, সামরিকীকরণ, নির্বাচনে কারচুপি ও অর্থপাচার ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংসে পরিণত হয় ।

কিন্তু এরশাদ সরকার রাষ্ট্রীয় কার্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস, উপজেলা ব্যবস্থা, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, জেলা সদরে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন, ভূমি সংস্কার পদক্ষেপ, ঔষধ নীতি প্রণয়ন, নারী নির্যাতন রোধে'পারিবারিক আদালত' প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,বহু রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো নির্মাণ করলেও বিভিন্ন মহলের বিরোধিতার কারণে তিনি এ সব বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৈধতা অর্জনের জন্য জেনারেল এরশাদ গণভোট, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ,ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন । তা-সত্ত্বেও ব্যক্তিগত নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ।

তাঁর শাসনামলে অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে দেশে মারাত্মক অর্থ সংকেটের সৃষ্টি হয় । যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করে অবশেষে জনতার রোষানলে গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ সরকারের পতন হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ সংসদীয় কার্যক্রম ঃ ১৯৮৬-'৯০

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের জাতীয় পার্টিতে যোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁদের প্রদান করেন । স্বতন্ত্র সদস্যগণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করিয়ে নেয় । ১৯৮৬ সালের ২৭ জুন পুরাতন সংসদ ভবনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদের সভাপতিত্বে ১৯৮৬-'৮৭ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেন অর্থ উপদেষ্টা এম. সাইদুজ্জামান । এ বাজেটের মূল লক্ষ্য ছিলো তৃতীয় পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা । কিন্তু উক্ত বাজেটে জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়নি ।[১]

১৯৮৬ সালের ৭ জুলাই জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্তে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিটি আসনে ১ জন করে মোট ৩০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে । তা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাছাই করা হয় । এবং সকল মনোনয়নপত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয় । প্রত্যেক মহিলা আসনে ১ জন করে প্রার্থী থাকায় ১৯৭৩ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১(১)ক অনুচ্ছেদ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন । ১০ জুলাই নির্বাচিত ৩০ জন মহিলা সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেন । এ মহিলা সংসদ সদস্যরা সকলে জাতীয় পার্টির সদস্য । ঐদিন ছিলো তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন । উক্ত অধিবেশন শুরুতে স্পীকার ও ডিপুটি স্পীকার নির্বাচন এবং কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয় । এর পরই প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ সংসদে উদ্বোধনী ভাষণ দেন । কিন্তু এই উদ্বোধনী অধিবেশনে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, সি.পি.বি, বাকশাল ও ন্যাপ দলীয় সংসদ সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেনি । তাঁরা ঘোষণা করেন, সামরিক আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত সংসদে যাবেন না । বাংলাদেশের সংসদের ইতিহাসে এটাই ছিলো প্রথম এক তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য কর্তৃক সংসদ বর্জন । উল্লেখ্য এ সংসদে সর্বাধিক বিরোধী দলীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলো ।[২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ১০ জুলাই উক্ত তৃতীয় জাতীয় সংসদের শামসুল হুদা চৌধুরী স্পীকার, কোরবান আলী ডেপুটি স্পীকার ও ডা. ফজলে বাব্বি চীপ হুইপ নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা ও আবদুল মালেক উকিলকে বিরোধী দলীয় উপনেতা নিযুক্ত করা হয় ।[৩] ১০ নভেম্বর সংসদ অধিবেশনে জাতীয় পাটি, আ.স.ম. আবদুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ক্ষুদ্রদলের কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের সহযোগিতায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ভোটে বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস হয় । এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইনের ক্ষমতা বলে গৃহীত সকল পদক্ষেপ ক্রিয়াকলাপ ও কার্যক্রমকে বৈধ করে নেয়া হয় ।[৪] অপরদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা অধিবেশন বর্জন করেন । ঐদিনই সারাদেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয় ।[৫]

৮ দলীয় ঐক্যজোট ঘোষণা করেন যে, তাঁরা সংসদের বাহিরে অন্যান্য সমমতাবলম্বী জনগণের সাথে গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে সার্বভৌম সংসদের নিকট জবাবদিহি মূলক, দুর্নীতিমুক্ত , গণতান্ত্রিক সরকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে । অন্যদিকে বি.এন.পি. নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দল জেনারেল এরশাদ সরকারকে উৎখাত করার আন্দোলন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ।[৬]

১৯৮৭সালের ২৪ জানুয়ারি জেনারেল এরশাদ জাতীয় সংসদে এক ভাষণে বলেন, আজ থেকে সরকারী সকল চিঠিপত্র বাংলায় লিখিত হবে । এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলাভাষা চালু করা হবে । প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংসদে ভাষণের সময় বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট সংসদ অধিবেশন বর্জন করেন ।[৭]

১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলের উত্থাপিত শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । শিক্ষাঙ্গণে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে গৃহীত প্রস্তাবটিকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একাংশ এবং কয়েকটি

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র সংগঠন উক্ত প্রস্তাবের নিন্দা জানান । তাঁরা বলেন, সরকার অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল ও শিক্ষাঙ্গণে অস্ত্র সরবরাহ করে শিক্ষাঙ্গণকে কলুষিত করেছে । তা-ই প্রয়োজন স্বৈরাচারী সরকারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে উচ্ছেদ করা । ১৯৮৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ' বাংলাভাষা' প্রচলন আইন সংসদে উত্থাপিত হয় । সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এ বিলটি আনয়ন করা হয় । সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা ' বাংলা ' হবে । ২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে 'বাংলা ভাষা' প্রচলন বিল পাস হয় ।[৮]

১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ জাতীয় সংসদে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের প্রস্তাব নাকচ করে এ আইনের সংশোধনকল্পে বিলটি জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় । উক্ত বিলে চোরাচালানের জন্য ন্যূনতম শাস্তির বিধান ও চোরাচালকৃত দ্রব্য সামগ্রী মওজুদ, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন ও বিক্রয়কে বিশেষ ক্ষমতা আইনে দণ্ডণীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য সংশোধনী আনা হয় । এ আইনটি ১৯৮৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে । উপস্থিত বিরোধী দলের প্রায় সকল সংসদ সদস্যই বিশেষ ক্ষমতা আইন বিলটি বাতিলের দাবী করেন । তাঁরা সংশোধনী পাসের পূর্বে বিলটি জনমত যাচাইয়ের দাবী জানান । এবং বলেন, এ আইনটি দেশে ফ্যাসীবাদের জন্ম দিবে । বিরোধী দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিশেষ ক্ষমতা আইন বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয় ।[৯]

১৯৮৭ সালের ১৮ জুন জাতীয় সংসদে ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরের বাজেট উত্থাপিত হয় । উক্ত বাজেটে ৩শ' ৭১ কোটি ১৯ লাখ টাকার নতুন কর আরোপসহ ৪শ' ১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করা হয় । জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী ৪ হাজার ৯শ' ১৫ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত রাজস্ব বাজেট পেশ করেন । এর মধ্যে ৪শ' ৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্বৃত্ত ধরা হয় । উক্ত বাজেটে নয়া কর প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিরোধীদলীয় ৮ দল, জামায়াত, স্বতন্ত্র ও মুসলিম লীগের সংসদ সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন ।[১০]

১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই সরকার জাতীয় সংসদে ' স্থানীয় সরকার ' সংশোধনী বিল মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পাস করে । এ বিলের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসেনে জড়িত করার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় । ৮ দলীয় জোটের সংসদ সদস্যরা উক্ত বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং সংসদ থেকে বেরিয়ে আসেন । ১৩ জুলাই বিল পাসের বিরুদ্ধে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের ডাকে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় । ২২ জুলাই জেলা পরিষদ বিল ও এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারাদেশে ৫৪ ঘন্টা ব্যাপী হরতাল পালিত হয় ।[১১] যার প্রেক্ষিতে ১ আগস্ট জেনারেল এরশাদ ' জেলা পরিষদ ' বিলটি পুনঃ বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠান ।[১২]

১৯৮৭ সালের ৫ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন । অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের এক সভায় জাতীয় সংসদ থেকে সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । যার ফলে ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির ঘোষণা দেন ।[১৩]

সারণী - ১

তৃতীয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন ও কার্য দিবস

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্য দিবস
প্রথম	১০-০৭-৮৬	২২-০৭-৮৬	১৩	৮
দ্বিতীয়	১০-১১-৮৬	১০-১১-৮৬	১	১
তৃতীয়	২৪-০১-৮৭	২৫-০৩-৮৭	৬১	৪১
চতুর্থ	১১-০৬-৮৭	১৩-০৭-৮৭	৩৩	২৫
			মোট কার্য দিবস	৭৫

সূত্র ঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারী শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের বিধি-বিধান অনুসারে ৬ ডিসেম্বর থেকে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে । পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করেন । উক্ত তারিখেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । কিন্তু ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট এ নির্বাচন বর্জন করে এবং ৩৬ ঘণ্টা প্রতিরোধ কর্মসূচি পালন করে । এ নির্বাচনে কয়েকটি ক্ষুদ্রদল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন ।[১৪]

১৯৮৮ সালের ২৫ এপ্রিল চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে । প্রেসিডিন্ট এরশাদ সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন । উক্ত সংসদের শামসুল হুদা চৌধুরী স্পীকার, রিয়াজউদ্দিন আহমদ ডেপুটি স্পীকার, ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে সংসদ নেতা নির্বাচিত করা হয় । অন্যদিকে সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ) ও স্বতন্ত্র ১৬ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে আ.স.ম. আবদুর রব বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত হন । এ সংসদ অধিবেশন সাংবাদিকগণ বর্জন করে । উল্লেখ্য সরকার সংবাদপত্র শিল্পের তিনটি ফেড়ারেশন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দাবি অনুযায়ী ২৪ এপ্রিলের মধ্যে বাংলার বাণীসহ সকল পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করায় সংসদ অধিবেশনে যোগদানে সাংবাদিকরা বিরত থাকেন । এ সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে ৩৪ টি অধ্যাদেশ উপস্থাপন করেন সংসদ নেতা মওদুদ আহমদ ।[১৫]

জেনারেল এরশাদ সরকার ১৯৮৮ সালের ১১ মে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে ৮ম সংশোধনী বিল পেশ করে । দেশের বিভিন্ন মহলের বিরোধীতা সত্ত্বেও ৮ জুন 'রাষ্ট্রধর্ম' ইসলাম বিল পাস করা হয় । প্রতিবাদে ১২ জুন ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় ।[১৬] উক্ত ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভেঙ্গে ঢাকার বাহিরে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটসহ ৬টি জেলা সদরে সুপ্রিম কোটের হাইকোর্ট বিভাগে একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ রাখার বিধান করা হয় । বিরোধী দলগুলো ঢাকার বাহিরে জেলা সদরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় । পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর দেশের আইনজীবীদের দাখিলকৃত এক রীট-পিটিশনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক ৮ম সংশোধনীর 'হাইকোট

Dhaka University Institutional Repository

বিকেন্দ্রী করণের' এ অংশ পরিপন্থী ঘোষণা করা হয় । ফলে জেলা সদরে হাই কোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন বাতিল হয় ।[১৭]

১৯৮৭ সালে জেনারেল এরশাদ পার্বত্য উপজাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাঁর পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয় । এ কমিটির রিপোর্টের আলোকে ১৯৮৯ সালের ৩১ মে জাতীয় সংসদে " পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" আইন পাস হয় । এ আইনের অধীনে বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এই ৩টি পার্বত্য জেলার জন্য ৩টি 'স্থানীয় পরিষদ' গঠন করা হয় ।[১৮] ১৯৮৯ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদে 'পল্লী পরিষদ' গঠন সংক্রান্ত বিল উত্থাপিত হয় । এ বিলের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ জীবনকে উন্নত করা এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গ্রামবাসীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা । ২০ জুন উক্ত বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ।[১৯] ১৩ জুন জাতীয় সংসদে পৌরসভায় মনোনীত 'ভাইস-চেয়ারম্যান' পদ সৃষ্টির বিল পাস হয় । বিরোধীদলীয় সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি সংসদে অনুমোদিত হয় । স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন পদ্ধতির আইন প্রবর্তনকে বিরোধীদল স্বায়ত্তশাসন ধ্বংসের চেষ্টা বলে আখ্যায়িত করেন ।[২০] ১৫ জুন জাতীয় সংসদে ১৯৮৯ -'৯০ অর্থ বছরের জন্য ২৮০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত সম্বলিত ৭১৮০ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট পেশ করা হয় । বিরোধী দলসমূহ নয়া বাজেটের সমালোচনা করে । সংসদে বাজেট উপস্থাপনার পরই রাজধানীতে বিরোধীদল বাজেট বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে ।[২১]

১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই সংবিধানের ৯ম সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে পাস হয় । এ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন । রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একই সময় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান করা হয় । এবং কার্যকাল ৫ বছর স্থির করা হয় । একাধিকক্রমে দুই মেয়াদের অধিক কেহ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না । এ বিধান আরোপিত হয় ।[২২]

১৯৯০ সালের ১০ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১০ম সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয় । এ বিলে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষে হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংবিধানের

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাভাষ্য সংশোধন এবং জাতীয় সংসদে মহিলাদের ৩০ টি আসন আরও ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন বিল পেশ করা হয় । বিরোধীদল এ বিলে আপত্তি জানান । রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নে সংশোধিত আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পূর্তির ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। ১২ জুন জাতীয় সংসদে ২২৬-০ বিভক্তি ভোটে বিরোধীদলের ওয়াকআউটের মধ্যে ১০ম সংশোধনী বিল পাস হয় । বিলটি ২৩ জুন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে ।[২৩] ১৯৯০ সালের ১৪ জুন জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী জেনারেল (অবঃ) এম. মুনীম ১৯৯০-'৯১ এর জাতীয় বাজেট পেশ করেন । উক্ত বাজেটে ৫৯৬ কোটি ৭৩ লাখ টাকার নতুন কর ধার্য করা হয় ।[২৪] বিরোধী দলের গ্রুপ নেতা শাজাহান সিরাজ সহ আরো কয়েকজন সংসদ সদস্য সংসদে বাজেট সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা করলে স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁদেরকে বক্তব্য রাখার সুযোগ না দেয়ায় সংসদ অধিবেশন ওয়াক আউট করেন ।[২৫] ১৯৯০ সালের ২৫ আগস্ট সংসদের বিশেষ অধিবেশনে সংসদ নেতা কাজী জাফর আহমদ সৌদী আরবে বাংলাদেশের সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তা জাতীয় সংসদে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । এবং এ অধিবেশনে এক প্রস্তাবে কুয়েত থেকে ইরাকী সৈন্য অপসারণ ও কুয়েতে আইন সঙ্গত সরকার প্রনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানানো হয় ।[২৬] এটাই ছিলো চতুর্থ জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -২

চতুর্থ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ও কার্য দিবস

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কায দিবস
প্রথম	২৫-০৪-৮৮	১১-০৭-৮৮	৭৮	৪৭
দ্বিতীয়	১৬-১০-৮৮	১৯-১০-৮৮	৪	৪
তৃতীয়	০১-০২-৮৯	০২-০৩-৮৯	৩০	২০
চতুর্থ	২২-০৫-৮৯	১০-০৭-৮৯	৫০	৩৫
পঞ্চম	০৪-০১-৯০	০৮-০২-৯০	৩৬	২৬
ষষ্ঠ	০৩-০৬-৯০	০১-০৮-৯০	৬০	৩৫
সপ্তম	২৫-০৮-৯০	২৫-০৮-৯০	১	১

মোট কার্য দিবস ১৬২

সূত্র ঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারী শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৮ জুন, ১৯৮৬ ।

২. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ৭-১০ জুলাই, ১৯৮৬ ।

৩. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৭৮-১৭৯ ।

৪. See Arun Kumar Goswami , "*The Grits of democratisation in Bangladesh*", Vol. 1, No. 1, *Bangladesh Political Science Review*, 2001 .

৫. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২১৫ ।

৬. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩১ ।

৭. দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৮৭ ।

৮. দেখুন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৩-১৪, ২০-২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ ।

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৪ মার্চ, ১৯৮৭ ।

১০. দৈনিক দেশ, ঢাকা, ১৯ জুন, ১৯৮৭ ।

১১. দেখুন দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৩-১৪, ২৩ জুলাই, ১৯৮৭ ।

১২. দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২ আগস্ট, ১৯৮৭

১৩. দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৬-৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ ।

১৪. দেখুন দৈনিক দেশ, ঢাকা, ৩-৪ মার্চ, ১৯৮৮ ।

১৫. দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৫-২৬ এপ্রিল, ১৯৮৮ ।

১৬. দেখুন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১২ মে, ৯-১৩ জুন, ১৯৮৮ ।

১৭. দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ।

১৮. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ বাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৬০ ।

১৯. দেখুন দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ৮-২১, ১৯৮৯ ।

২০. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৪ জুন, ১৯৮৯ ।

২১. দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৪-১৬ জুন, ১৯৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

২২. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১ ।

২৩. দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১১-২৪ জুন, ১৯৯০ ।

২৪. The Bangladesh Observer, Dhaka, 15 June, 1990.

২৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৫ জুন, ১৯৯০ ।

২৬. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৬ আগস্ট, ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন । তিনি প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে ঢাকার বাহিরে ৬টি জেলা সদরে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন ও নারী নির্যাতন রোধে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯৮২ সালের ২৮ এপ্রিল এরশাদের নির্দেশে জেনারেল মুনীমের নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক পুনবিন্যাস কমিটি গঠিত হয় । এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাক্তন ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় উন্নীত এবং মহাকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয় । এ ব্যবস্থাধীনে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা পরিষদে জনগণের প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন । সরকার নিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপর পরিষদের সচিবের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় । স্থানীয় সরকার উন্নয়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর অর্পিত হয় । বিচার ব্যবস্থাকে উপজেলা পর্যায় স্থানান্তরিত করায় উপজেলাকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নিম্নস্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ।[১]

জেনারেল এরশাদ নতুন বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক জরাজীর্ণ ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন । এটি ছিলো তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত । বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট ভেঙ্গে ঢাকার বাহিরে চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয় । বিচারপতিদের ১৫ জুনের মধ্যে হাইকোর্টে কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ দেন এবং বলা হয় মামলার স্তূপ জমে থাকার কারণে বিচারকার্য বিলম্ব ঘটে এবং মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে সুতরাং অপেক্ষামান মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সুপ্রিমকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হলো । পরবর্তীতে কুমিল্লা, বরিশাল ও সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয় ।[২]

হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিবাদে, সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি প্রতিবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করে যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ জন প্রখ্যাত আইনজীবীকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় । ১৯৮২ সালের ১৬ অক্টোবরে এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে আইনজীবীগণ অন্দোলনের হুমকি দেন । ফলে গ্রেফতারকৃত আইনজীবীদের মুক্তি দেয়া হয় ।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে মন্ত্রিপরিষদ থেকে প্রচারিত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, সরকার থানাগুলিকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । উন্নয়নের এ কর্মকাণ্ড থানা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হবে । থানা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছে সকল কর্মকর্তা দায়ী থাকবে । থানা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত থানা নির্বাহী অফিসার উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন । প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫টি থানাকে উন্নীত থানা ঘোষণা করা হয় । পরে সব থানাগুলিকে পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হবে ঘোষণা দেয়া হয় । ডিসেম্বর মাসে এক অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়, যার কার্যক্রম ৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিলো । কিন্তু ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে উপরোক্ত অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে উন্নীত থানার পরিবর্তে উপজেলা নামকরণ করা হয় । এবং থানা নির্বাহী অফিসারের নাম পরিবর্তন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার করা হলো । ঔপনিবেশ শাসনামলের থানার পরিবর্তে উপজেলা প্রবর্তন একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ । উপজেলা সৃষ্টিতে মহাকুমা প্রশাসন বাতিল হলো এবং সকল মহাকুমা জেলায় উন্নীত হয়ে ৬৪টি জেলায় পরিণত হয় ।[৪] এটি ছিলো জেনারেল এরশাদের বৈপ্লবিক সংস্কার ।

উপজেলা সদরগুলোর আধুনিকায়নের জন্য রাজকীয় অট্টালিকা নির্মানে দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে । ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকল্পে প্রচুর বনজসম্পদ নিধন করার ফলে কৃষিজমির সংকোচন হয় । বিদেশী ঋণের উপর ভিত্তি করে মূলত গড়ে উঠে এসব অট্টালিকা । উপজেলায় অর্থ সমাগমের কোন উৎস ছিলো না । বিদেশি সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত গমই প্রকল্প বাস্তবায়নের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাড়ায় ।[৫]

১৯৮৮ সালের ৭ জুন সংবিধানের ৮ম সংশোধনী বিল পাস হয় । উক্ত বিলে রংপুর, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামসহ দেশের ৬টি জেলা সদরে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের বিধান অনুমোদন করা হয় ।[৬] এর বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে !

৮ জুন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আদালত বর্জন, সভা ও শোভাযাত্রা করে সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান । আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে ১৪ জুন সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় । সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করা হয় । দেশের

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতনামা আইনজীবীগণ মোকদ্দমা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে । সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ ৩১ কার্যদিবসে পূর্ণ শুনানী শেষে ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ, বিচারপতি এম. এইচ. রহমানএবং বিচারপতি আফজালের সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠিত হয় । উক্ত বেঞ্চে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে আপিলটি মঞ্জুর করে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর 'হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদটি মূল কাঠামোর পরিপন্থী বলে রায় ঘোষণা করা হয়' । সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতিগণ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ এ অংশটি বাতিল ঘোষণা করে যে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন তা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে অভিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ।[৭]

হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণে আরও সমস্যার সৃষ্টি হলো । মফস্বল হাইকোর্টে যেসব আইনজীবী ছিলো তাঁরা জজকোর্টের দক্ষ আইজনীবী হওয়া সত্ত্বেও হাইকোর্টের মামলা পরিচালনা করার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলো না । সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে রাজধানী থেকে আইনজীবীদের মফস্বল হাইকোর্টে নিয়োগ করতে হয়, এতে খরচ দ্বিগুণ বেড়ে যায় । তা ছাড়া উপজেলা কোর্ট দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয় ।[৮]

এরশাদ কর্তৃক গৃহীত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ উপজেলা পদ্ধতি পল্লী অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিলো । কিন্তু দুর্নীতির কারণে তা সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি । তথাপিও এরশাদ শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ভাল কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ উপজেলা ব্যবস্থা ।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৫৯-৩৬০

২. মেজর রফিকুল ইসলাম পি.এস.সি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.১২০

৩. আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৫-২৬

৪. প্রাগুক্ত, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭০-৭১

৫. এম. এস. এম. নাসিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৪১

৬. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃ. ২৬০

৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পাঃ), নব্বুই - অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৮০

৮. আতাউর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

৯. তালুকদার মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ,বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ অর্থনৈতিক গতিধারা

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভের পূর্বেই রাজনৈতিক বিপর্যয় দেশের অর্থনীতিকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয় । রাজনৈতিক পরিস্থতির প্রকট সংকটে দেশের অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ আনয়ন সম্ভব হয়নি । পরবর্তীতে সরকারগুলোর অপরিকল্পিত, সামঞ্জস্যহীন ও পরনির্ভরশীল অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেউলিয়া করে দেয় । অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাচারীতায় দেশে মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয় । ফলে এরশাদ সরকারের শাসনামল মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয় । অর্থনীতির অব্যবস্থার জন্য তৎকালীন অর্থমন্ত্রীকে অপসারণ করা হলেও সংকট কাটিয়ে উঠতে জেনারেল এরশাদ সক্ষম হয়নি ।১

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন । এর পর ২৪ মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলো তাঁর স্বৈরশাসন । এ সময় তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে সুপরিকল্পিতভাবে সামরিকীকরণ করেন । তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে অর্থনীতিতে । ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি অর্থনীতিকে সংকটময় অবস্থা দৃষ্টে আবদ্ধ করেন । দুর্নীতি, লুট-তরাজ; চোরাচালান ও আমদানী ইত্যাদি অর্থনৈতিক তৎপরতা কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে পরিণত হয় । জেনারেল এরশাদ তাঁর পরিবারবর্গ, সামরিক-বেসামরিক আমলারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিক্রি ও পাচারে অংশগ্রহণ করে । স্বাধীনতার পর যে লুটেরা ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে তাঁরা ১৯৭৬ সালের পর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পান । ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ শ্রেণীটি সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় । এসময় জনগণের জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায় ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে । তখন মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি । সামরিক এবং বিভিন্ন অনুৎপানদশীল খাতে ব্যাপক ব্যয় বৃদ্ধি পায় । রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের কয়েকশত কোটি টাকা মওকুফ করা হয় । কিন্তু বাড়ানো হয় জনগণের উপর করের বোঝা । কমানো হয় ভর্তুকি ।[২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ - ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি লুট-পাটে বিপর্যস্ত হয় । এ বিষয়ে একটি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সারণী -১

বাজেট ব্যয় সারাংশ - ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	বৈদেশিক সাহায	উন্নয়ন কার্যক্রম	প্রতিরক্ষা	নিরাপত্তা	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	বৈদেশিক ঋণ	বেতন ভাতা
৮০-৮১	২৩৪৩	১৪১৮	১৮১৬	২৩৬৯	৩২৫	৪৩৬	৩০৩	২০৭	১০৬	২৭৫
৮৪-৮৫	৩৪৭৭	২৯৩০	৩৩০৭	৩৫০৭	৫৬৬	৭৩৪	৬১২	৩৭০	৫৮৬	-
৮৫-৮৬	৪০৩৭	৩৪২০	৪০১৮	৪০৯৫	৬৭৮	৮৯০	৭৮২	৩১৩	৭৭৬	১৩৩৬
৮৬-৮৭	৪৭১১	৩৯৫৬	৪৩৭২	৪৫১৩	৮৯২	১০৬৯	৯৬১	৪৯৭	১০৪৬	১৪৮৫
৮৭-৮৮	৫১৪৬	৪৭৩০	৫০৮৬	৪৬৫১	৯৩৪	১২১২	১০৭২	৫৬২	৯২৮	১৭১১
৮৮-৮৯	৫৮২২	৬১৭০	৪৮৮৫	৪৫৯৫	১১৩৯	১৪৩৯	১২০৬	৬৩৮	১১৫৪	১৯১০
৮৯-৯০	৭১৮০	৬৯০০	৫৯৫৬	৫৮০৩	১১৩২	১৪৬০	১৩১৫	৭৯৩	১২৮৩	১৯৬০

সূত্র ঃ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাজেট, ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০ ।

উল্লেখিত সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সঞ্চয় বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা এবং ভোগখাতে খরচের যে বহর তাতে বৈদেশিক সাহায্য সঙ্কলন দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলো । কিন্তু তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২

রাজস্ব ব্যয়ের বিভিন্ন খাত - ১৯৮৯-৯০

খাত	বরাদ্দের পরিমান
সাধারণ প্রশাসন, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২১০.৪৭
পুলিশ	৩০৩.৬০
বি. ডি. আর.	১৩০.৩১
সাধারণ কার্যক্রম	১৭৩.৬৪
প্রতিরক্ষা	১১৪৮.৯২
শিক্ষা	১০৯৩.৮৫
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	৩৬৬.৭৮

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮৮/৮৯ ।

- ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্ধ ছিলো সর্বোচ্চ অবস্থানে । প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের চেয়ে অনেকগুণে বেশি ছিলো ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩

জেনারেল এরশাদ সরকারের প্রবৃদ্ধির হার - ১৯৮২-৮৯ নিম্নরূপ

বছর	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত প্রবৃদ্ধি
১৯৮১-৮২	৫.৪	০.৯৪
১৯৮২-৮৩	৬.৪	৩.৬৯
১৯৮৩-৮৪	৬.০	৪.২০
১৯৮৪-৮৫	৬.২০	৩.৯৩
১৯৮৫-৮৬	৫.৫	৪.০১
১৯৮৬-৮৭	৫.২	৪
১৯৮৭-৮৮	৫.২	২.৯৫
১৯৮৮-৮৯	৬.০	২.৯

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮১-৮৯

১৯৮২ থেকে ৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থবির হয়ে পড়েছিলো । ফলে গণঅভ্যুত্থান অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে টাকার মান উল্লেখযোগ্য হারে অবমূল্যায়ণ হয় যথাক্রমে শতকরা ১৮.৫৮ ও ১৫.৫৬ ভাগ । ১৯৮৯-৯০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচবার টাকার অবমূল্যায়ন ঘটে ।[৩]

সারণী - ৪

জি ডি পি বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির হার

অর্থ বছর	জি ডি পি বৃদ্ধির % হার	মুদ্রাস্ফীতির % হার
১৯৮০-৮১	৬.৮	১২.৪
১৯৮১-৮২	০.৮	১৬.৩
১৯৮২-৮৩	৩.৬	৯.৯
১৯৮৩-৮৪	৪.২	৯.৬
১৯৮৪-৮৫	৩.৭	১০.৯
১৯৮৫-৮৬	৫.০	৯.৯
১৯৮৬-৮৭	৩.৮	১০.৪
১৯৮৭-৮৮	২.১	১১.৪
১৯৮৮-৮৯	২.৩	৮.০
১৯৮৯-৯০	৫.৫	৯.৩

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ও বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, ১৯৯০

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, বাণিজ্য ভারসাম্যসহ সমগ্র অর্থনীতিতে টাকার অবমূল্যায়ণ পরবর্তীতে কোন ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ১৯৮২-৯০ সালের মধ্যে খাদ্য ভর্তুকির শতকরা ৮০ ভাগ অগ্রাধিকার খাতেই ব্যয় করা হয় । এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত সেনাবাহিনী, বি. ডি.আর ও পুলিশ । জেনারেল এরশাদ সরকার বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শক্রমে দেশের দরিদ্র লোকদের জন্য বরাদ্দকৃত রেশনের দাম ও খাদ্যের দাম বৃদ্ধি করেন । কিন্তু সেনাবাহিনী, বি.ডি.আর ও পুলিশের রেশনের দাম একবারও বাড়ায়নি এবং ভর্তুকিও হ্রাস করেনি । বরং সামরিক বাহনী, বি.ডি.আর ও পুলিশের ক্ষেত্রে ভর্তুকি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করে নামমাত্র মূল্যে রেশন দেয়া হয় । ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে জেনারেল এরশাদ সরকার ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন । এর মধ্যে জনগণ পান মাত্র ৪০ কোটি টাকার সমান খাদ্য ভর্তুকি । অপরদিকে সেনাবাহিনী, বি.ডি.আর ও পুলিশ পেয়েছে ১১০ কোটি টাকার খাদ্য ভর্তুকি ।[৪]

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হয় । এ সময়ই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শুরু হয় । এতে অনেক দাতা দেশসমূহ তাদের সাহায্য স্থগিত করে দেয় । যার প্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস পায় । বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা এবং প্রশাসন খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের দরুণ আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রত্যাশা পুরণ সম্ভব হয়নি । তা ছাড়া ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । ফলে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার পূর্বের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার চেয়ে নিচে নেমে আসে ।[৫]

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) কর্মসূচির আওতায়, গ্রামীণ দরিদ্রদের সংঘটিত করার জন্য জোর দেয়া হয়েছিলো ।[৬]

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কিছু অসমাপ্ত কাজের বরাদ্দ পুনঃ সংশোধন করে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) কর্মসূচির আওতায় ও দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান ও আয়ের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৫,৪০০ কৃষক সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিলো । এ সমিতির সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয় । উক্ত কর্মসূচির অধীনে ১৬,০৯০ টি বিত্তহীন ও মহিলা সমবায় সমিতি গঠিত হয় । ১৯৯০ সালের জুন মাসে ৫৬৮ টি গুচ্ছগ্রাম স্থাপিত হয় । এ গুচ্ছগ্রামগুলিতে প্রায় ২১,০০০ বিত্তহীন পরিবারের পুনর্বাসন ঘটে । পাশাপাশি উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোও কর্মসূচির আওতায় আনা হয়।[৮] চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মহিলা ও বিত্তহীনদেরকে পুনর্বাসন করা হলেও তা ছিলো অপ্রতুল ।

সারনী - ৫

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চিত্র

পরিকল্পনার নাম	টাকার পরিমান	প্রকৃত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত শতাংশ
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫	১৭২০০	১৫২৯৭	৫.৪%	৩.৮%
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০	৩৮৬০০	-	৫.৪%	৩.৮%

সূত্র ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

- দেশে রাজনৈতিক গোলযোগ ও সরকারের দুর্নীতির ফলে পরিকল্পনা বাধাগ্রস্থ হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬

রপ্তানী আয় ও আমদানীর ব্যয় চিত্র

অর্থ বছর	রপ্তানী আয়	আমদানী ব্যয়	উদ্বৃত্ত (+) / ঘাটতি (-)	
১৯৮২-৮৩	১৬১৬.৩	৫৪৮৮.৯	(-)	৩৮৭২.৭
১৯৮৩-৮৪	১৯৯০.২	৫৮৪৩.৩	(-)	৩৮৫৩.১
১৯৮৪-৮৫	২৪১৫.৫	৬৮৭৭.৭	(-)	৪৪৬১.৫
১৯৮৫-৮৬	২৪৩১.৪	৭০৬৫.০	(-)	৪৬৩৩.৬
১৯৮৬-৮৭	৩২৬৩.২	৮০২৬.১	(-)	৪৭৬২.৯
১৯৮৭-৮৮	৩৮০৮.১	৯৩৪৭.০	(-)	৫৫৩৮.৯

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮৮-৮৯, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ।

উল্লেখ্য যে, আমদানী ব্যয়ের তুলনায় রপ্তানী আয় কম হওয়ায় দেশের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় ।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের শাসনামলে রাজনৈতিক সংকট দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে । ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সীমাহীন দুর্নীতি সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলে । ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়, সম্পদের লুট-পাট, বৃহত্তর জনমণ্ডলীর সীমাহীন দারিদ্রতা ও আর্থিক দৈন্যতা সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষের সৃষ্টি হয় । তা ছাড়া বিরোধীদল কর্তৃক ঘন ঘর হরতাল রাষ্ট্রীয় উৎপাদনের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে । এতে ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমান আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় । দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ও লুট-পাট এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয় । এ অর্থনৈতিক দুর্নীতিই রাষ্ট্রকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয় । এরশাদ সরকারের অপরিকল্পিত, অবাস্তব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা দেশকে দেউলিয়া করে ফেলে । একদিকে উন্নয়নের নামে অনুন্নয়ন খাতে বিপুল ব্যয় ও বিদেশে অর্থ পাচার অপরদিকে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভঙ্গুর করে দেয় ।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. মেজর রফিকুল ইসলাম পি.এস.সি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১১৬ ।

২. দেখুন সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৯১ ।

৩. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৮ম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা- ১৩৯৭, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৩ ।

৪. হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭৫-৭৬ ।

৫. মোঃ শামসুল কবীর খান, বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮ ।

৬. *Government of Bangladesh Second Five year plan, 1980-85*, GOB Dhaka,1980, p.178.

৭. *Government of Bangladesh, Third Five year Plan, 1985-90*, GOB, Dhaka, 1985, p. 38.

৮. শওকত আরা হোসেন (সম্পাঃ), রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ৬৯ ।

৯. ফেরদৌস হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি, নির্ঝর পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬১ ।

১০. মোহাম্মদ সোলায়মান, "রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট ঃ এরশাদের শাসনকাল", রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ৩৭-৩৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন । তারপর তিনি দীর্ঘ নয় বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁর ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় । যার পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। এ গণআন্দোলন পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে । দীর্ঘ নয় বছর শাসনামলে তিনি কিছু ভাল কাজ করলেও দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, সামরিকীকরণ, হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্বাচনে কারচুপি ইত্যাদি ছিলো তাঁর আমলের প্রধান বৈশিষ্ট্য । আর এ কারণে তাঁর শাসনামল বাংলাদেশের স্বাধীনতাউত্তর কালের সবচেয়ে কলংকিত অধ্যায় হিসাবে আখ্যায়িত ।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে উপজেলা সৃষ্টি এবং ঢাকার বাহিরে ৬টি জেলা সদরে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করেছেন । পথকলি ও গুচ্ছগ্রামের মত উত্তম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন । তা ছাড়াও এরশাদ সরকার নারী নির্যাতন রোধে 'পারিবারিক আদালত', ভূমি সংস্কার পদক্ষেপ, পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইন, ঔষধ নীতি প্রণয়ন, বহু সেতু, সড়ক ও অবকাঠামো নির্মান করেন । তাঁর শাসনামলে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় দেশের ভাবমূর্তি যতটুকু উজ্জ্বল হয়েছিলো তার বেশী কালিমালিপিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত নগ্নতায় । দীর্ঘ নয় বছরে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে অসংখ্য গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিদর্শন করে ব্যাপক গণসংযোগ করলেও নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান । তিনি গণতন্ত্রকে হত্যা করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিধ্বস্ত করেন । লুণ্ঠন করেন জাতীয় সম্পদ । তিনি জাতীয় জীবনে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন । এবং গণতন্ত্র চর্চার সকল দরজা বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২-'৯০ সাল পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ বেসামরিক কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনী সদস্যদের মর্যদা, সুযোগ-সুবিধা, পদোন্নতি, অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি, ভর্তুকি রেশন ও উন্নত আবাস ইত্যাদির ব্যবস্থা অধিকগুণে বাড়ানো হয়েছিলো । প্রশাসনের উচ্চপদে সামরিকবাহিনী সদস্যদের নিয়োগের মাধ্যমে বেসামরিকীকরণের বিষয়টি জেনারেল জিয়ার শাসনামলে শুরু হলেও জেনারেল এরশাদের সময় তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় । তাঁর নয় বছরে সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনামলের সরকার ও প্রশাসন সামরিকীকরণের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে ।

জেনারেল এরশাদ শাসনামলকে নির্বাচনে কারচুপির জন্য দায়ী করা হয় এবং মূলত এ সময় থেকেই নির্বাচনে কারচুপি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে । উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই বাংলাদেশের নির্বাচনে কারচুপির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয় । যদিও এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার মত সাংগঠনিক শক্তি ও জন সমর্থন ছিলো । তথাপিও দলটি কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করে । ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে কারচুপির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায় । ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনে নজীর বিহীন কারচুপি হয় । এ নির্বাচনে কারচুপির জন্যে দায়ী এরশাদ সরকার । তিনি নির্বাচনকে প্রহসনে পর্যবসিত করেন ।

জেনারেল এরশাদ বৈধতার সংকট কাটিয়ে উঠার জন্যে গণভোট, সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন । কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বৈধতার সংকট কাটিয়ে উঠতে তিনি সফল হতে পারেন নি । আর এই ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তিনি দীর্ঘ নয় বছর ক্ষমতায় থাকেন ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ সরকারের পতন হয় । এ গণআন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ও চিকিৎসক, আইনজীবী, ছাত্র, সংস্কৃতিক কর্মী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন । তবে আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো । কিন্তু এ আন্দোলন ছিলো শহরকেন্দ্রিক । গ্রামের অধিকাংশ জনগণ এই আন্দোলনে শরীক হয়নি । অপর দিকে শহরগুলোতে সরকারী কর্মচারীগণও প্রশাসন ভবন ছেড়ে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে । ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সকল দল অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে আ.স.ম. রবের একটি ছোট দল ব্যতীত অন্য সকল দল জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলো । জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের ন্যায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনে শরীক হয়ে তাঁর পতন ঘটায় । জেনারেল এরশাদ যদি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হতেন, তা হলে নগ্নভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হতনা ।

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

Ahmed, Emajuddin, *Military Rule and Myth of Democracy*, University Press Ltd, Dhaka,1988

———————— *Bureaucratic Elite in Segmented Economics Growth : PAKISTAN AND BANGLADESH*, University Press Ltd, Dhaka, 1980

———————— *Bangladesh Politics*, Centre for Social Studies, 1980

Ahmed, Kamruddin, *The Social History of East Pakistan*, Pioneer Press, Dhaka. 1969

Anisur, Rahman Mohammad, *East and West Pakistan : A problem in the Political Economy of Regional planning*, Cambridge, Centre for International Affairs, Harvard University, 1968.

Ayub, M and Subramamyam, K, *The Liberation War*, Delhi, S. Chand & Co. 1972

Ali, Tariq, *Pakistan Military Rule of Peoples Power*, London Janathan Cape Ltd, London, 1970.

Beveridge, Lord, *Inida Called Them*, Allen and Unwin Ltd, London, 1957

Bhattacharjee, G.P. *Renaissance and Freedom Movement in Bangladesh, : The Minerva Associates*, Calcutta, 1973

Bill James, A. & Hardgrave L, *Comparative Politics the Quest for theory*, Printed in the United States of America,1973

Dhaka University Institutional Repository

Binder, Leonard, *Religion and Politics in Pakistan*, Berkeley, University of California Press, 1961

Chowdhury, A. K, *The Independence of East Bengal*, Jatiya Grantha Kendra, Bangladesh, 1984.

Chowdhury, Mostafa, *Pakistan its Politics and Bureaucracy*, Associate Publishing House, New Delhi, 1988.

Chowdhury, Najma, *The Legislative Process in Bangladesh : Politics & Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, University of Dhaka, 1980.

Chowdhury, G. W, *The Last Days of United Pakistan* , C Hurst and Company, London, 1974

———————— *Democracy in Pakistan*, : Green Book House, Dhaka , 1969.

Chatterjee, Sisir, *Bangladesh : The Birth of a Nation*, Book Exchange, Calcutta,1972.

Chakravarty, S. R. & Naraen Verandera, *Bangladesh History and culture*, South Asian Publishers, New Delhi, 1986.

Feldman, Herbert, *Revolution in Pakistan : A Study of the Martial Law Administration*, Oxford University Press, London, 1967.

Dhaka University Institutional Repository

Goswami, Arun Kumar , *"The Grits of Democratisation in Bangladesh," in Bangladesh Political Science Review*, Vol. 1, No.1, 2001, Department of Political Science, University of Dhaka.

Hakim, Mohammad A,. *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, University Press Ltd, Dhaka, 1993.

Harun, Shamsul Huda, *Parliamentary Behavior in a Multi-National State (1947 - 1954) : Bangladesh Experience*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984.

Haq, Mahbub-ul, *The Strategy of Economic Planning : A ase Study of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, 1963.

Holsti, K. J, *International Politics A Frame work for Analysis*, INC, London, 1995

Huntington, S.P, Political Order in Changing Societies : Yale University Press, New Haven, 1968.

Islam, M. Nazrul , *Problems of Nation Building in Developing Countries : The case of Malaysia* , University of Dhaka, 1988

———————— *Pakistan and Malaysia : A Comparative study in National Integration*, Sterling Publishers Ltd, New Delhi : 1989

———————— *"Bangladesh" in J. C. Johari (et. al.), Government and Politics of South Asia*, Sterling Publishers Ltd, New Delhi, 1991

Dhaka University Institutional Repository

________________	*"Bangladesh : New Threats and Old Insecurities" in Lee Edwards (ed.), The Global Economy : Changing Politics, Society and family, Minnesota*; Paragon House Publishers , 2001
Islam, Syed Serajul,	*Bangladesh State and Economic Strategy*, The University Press Ltd, Dhaka, 1988
Jahan, Rounaq,	*Bangladesh Politics : Problems and Issues*, The University Press Ltd, Dhaka, 1980
____________	*Bangladesh Promise and Performance*, The University Press Ltd, Dhaka, 2000
_____________	*Pakistan : Failure in National integration*, Columbia University Press , 1972
Jenings, I,	*Constitutional Problem in Pakistan*, Cambridge University Press, Cambridge, 1957.
Kamal, Kazi Ahmed,	*Sheikh Mujibur Rahman and Politics in Pakistan*, Shainpukur Art Press, Dhaka, 1970.
Kesworth, Mary Haw and Cogan Mourice,	*Encyclopedia of Government and Politics, Vol. 1*, London, 1992
Khan , Mohammad Ayub,	*Friends Not Masters A Political Autobiography*, Oxford University Press, Karachi, Lahore, 1967
Khan, Fazal Muqueem,	*Pakistan's Crisis in Leadership*, National Book Foundation, Lahore, 1973.
Maniruzzaman, Talukdar,	*Politics and the Emergence of Bangladesh*, Bangladesh Books International Ltd, 1975

Dhaka University Institutional Repository

———— *The Politics of Development : The Case of Pakistan (1947-1959)*, Green Book House Ltd, Dhaka, 1971.

———— *Politics and Security of Bangladesh*, University Press Ltd, Dhaka, 1994

———— *Bangladesh Revolution and its after maths*, University Press Ltd, Dhaka, 1988

Marcus, Franda, *Bangladesh : The Fist Decade*, New South Asian Publishers, Delhi, 1982.

Masoom, Abdul Latif, *Dilemmas of A Military Ruler A Political study of the Zia Regime*, Afsar Brothers, Dhaka, 2000

Muhammad, A. Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, The University Prfess Ltd, Dhaka, 1993.

Mahamood , Safdar, *Pakistan Divided*, Alpha Bravo, New Delhi, 1983

Rahman, A. H.M. Aminur, *Politics of Rural Local Sele-Governmet in Bangladesh*, University of Dhaka, 1990.

Rizivi, Hasan Askari, *The Military and Politics in Pakistan*, Progressive Publishers, Lahore, 1974.

Salik, Siddiq, *Witness to Surrender*, Oxford University Press, Karachi, 1977.

Sen, Gupta Jyoti., *Bangladesh : In Blood and Tears*, Naya Prakash Publishers, New Delhi, 1981.

Singh, Sheelendra Kumar , *Bangladesh Documents, Vol. I*, The University Press Ltd, 1999,

Dhaka University Institutional Repository

Sen, Rangalal, *Political Elites in Bangladesh*, University Press Ltd, 1986

Sayeed, Khalid B, *Politics in Pakistan the Nature and Direction of change*, Printed in United States, 1980

Sikder, Md. Mizanur Rahman, *Military in Bangladesh Politics : A case study of Ershad Regime*, (Ph.D. Thesis) Dhaka University, 1997

Umar, Badruddin , *Politics and Society in Bangladesh*, Subarna, Dhaka, 1987

Weiner, Myron, *Party Building in a New Nation : The Indian National Congress*, University of Chicago Press, Chicago, 1967.

Zillur, Rahman Khan, *Mirtial Law to Martial Law, Leadership Crisis in Bangladesh* , University Press Ltd, Dhaka, 1984

Ziring, Lawrence, *The Ayub Khan Era : Politics in Pakistan 1958-1969*, Syracuse University Press, 1971.

———————— *Bangladesh from Mujib to Ershad an interpretive study*, University Press Ltd, Dhaka, 1992

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গ্রন্থ

আহমদ, এমাজউদ্দীন,	বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৩
————————	সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক , সৈয়দ আবদুল করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৯৩
————————	বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০১ ।
আহমদ, মওদুদ,	বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৮৭
————————	বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯২
আজাদ, আবদুর রহিম ও রেজা, শাহ আহমদ,	বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রকৃতি ও প্রবণতা ২১ দফা থেকে ৫ দফা, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৭
আহমদ, সালাহ্উদ্দীন অন্যান্য (সম্পাঃ),	বংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭ - ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
————————	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩
আহমেদ, ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন (অবঃ),	বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতি, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ, লেনিন, — উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঃ রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯১

আলী, সৈয়দ মোদাচ্ছের, — গণঅভ্যুত্থান ও বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ, অল্প কথা, ঢাকা, ১৯৯৩

আহমেদ, সিরাজউদ্দিন, — বাংলাদেশ গড়লো যারা, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

আহমদ, আবুল মনসুর, — আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিসস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫

ইসলাম, মেজর রফিক পি এস সি, — স্বৈরশাসনের নয় বছর ঃ ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯১

_____ — সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

ইসলাম, সিরাজুল, — বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ - ১৯৭১, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩

ইসলাম, মোহাম্মদ জহিরুল, — বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ, ইমপ্রেস পালিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৩

ইসলাম, মোহাম্মদ নুরুল, — বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও বাকশাল প্রবর্তন ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, (পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

ইসলাম, এম. এস.এম. নাসিরুল, — বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯২

উমর, বদরুদ্দীন, — বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, মুক্তধারা, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

————	সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৮৯
কাসেম, মোহাম্মদ আবুল,	তুলনামূলক রাজনীতি, ডায়মণ্ড কর্ণার, ঢাকা, ১৯৯০
কামাল, মোস্তফা,	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
করিম, জাওয়াদুল,	গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
কায়সার, আশরাফ,	বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫
খান, আতাউর রহমান	প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮
খান, মোঃ শামসুল কবীর,	বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০০
চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম,	উপনিবেশের সংস্কৃতি, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
————	এরশাদের পতন বি বি সি সহ বিদেশী গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯২
———— ও হাসনাত আবুল,	নব্বুই-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১
চৌধুরী, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন (অবঃ) বীর বিক্রম,	একজন জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০
জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান,	আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬
জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাঃ)	গণতন্ত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫
তালুকদার,আবদুল ওয়াহেদ,	'৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

নাথ, বিপুল রঞ্জণ, প্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৪

ফিরোজ, জালাল, পার্লামেন্টারি শব্দ কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, রাজনীতির সামরিকীকরণ প্রেক্ষিত ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৮২-৯০, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯১

———————— বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, ২০০১

মুহিত, আবুল মাল আবদুল, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯১

মিয়া, এম.এ. ওয়াজেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯৭

মামুন, মুনতাসীর, বাংলাদেশের জন্ম , দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯৬

মকসুদ, সৈয়দ আবুল(সম্পাঃ), গণআন্দোলন ঃ ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১

মজিদ, মুস্তফা (সম্পাঃ), রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, পরিচালক প্রাশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪

রহিম, মুহম্মদ আবদুর, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭ -১৯৪৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪

———————— বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৫

রহমান, মোঃ শফিকুর, জাতীয় রাজনীতি শেরেবাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, গাজী শামছুর, — গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, — বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

রশিদ,-হারুন-অর, — বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭ - ২০০০, নিউএজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১

রহমান, মোঃ মাহবুবর, — বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭ - ৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

সোবহান, রেহমান, — বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

হাননান, মোহাম্মদ, — বাঙালির ইতিহাস, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

———— — বাংলাদেশের সামরিক ইতিহাস ও ট্র্যাজেডির সেনানিবাসে শেখ হাসিনা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

———— — বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এরশাদের সময়কাল, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

———— — হাজার বছরের বাংলাদেশ ইতিহাসের এ্যালবাম, সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৯৫

হাসানউজ্জামান, — নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, অক্ষর, ঢাকা, ১৯৯২

———— — বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, ফেরদৌস, বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি, নির্ঝর পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৪

———— (সম্পাঃ), রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, ১ম সংখ্যা, জুন- ডিসেম্বর ১৯৯১, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা (বাংলা ও ইংরেজি)

দৈনিক সংবাদ (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক বাংলা (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক ইনকিলাব (ঢাকা) (১৯৮৩-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক বাংলার বাণী (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক সংগ্রাম (ঢাকা) (১৯৮৩-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক দেশ (ঢাকা) (১৯৮২ - ৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

সাপ্তাহিক ছুটি (ঢাকা) (১৯৮২-১৯৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ (ঢাকা) (১৯৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

সাপ্তাহিক বিচিত্রা (ঢাকা) (১৯৯০-৯১ জানুয়ারি এর বিভিন্ন সংখ্যা)

The Bangladesh Observer (Dhaka) (১৯৭৫-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

The Bangladesh Times (Dhaka) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

The Times (London) (১৯৪৭-৭৫ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

Weekly Holiday (Dhaka) (১৯৭৫ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

Dhaka University Institutional Repository

দলিলপত্রসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৮
তৃতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫ - ৯০,	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৬
The Constitution of the People's Republic of Bangladesh ,	Dhaka, Bangladesh Government Press,1979
এরশাদ সরকারের ঘোষণাপত্র	.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

জেনারেল এরশাদের সামরিক আইন-জারির ঘোষণাপত্র

Registered No. DA-1
The Bangladesh Gazette
Extraordinary
Published by Authority
Wednesday, March 24, 1982

GOVERNMENT OFTHE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH PROCLAMATION OF MARTIAL IAW

WHEREAS a situation has arisen in the country in which the economic life has come to a position of collapse, thecivil administration has become unable to effectively function, wanton corruption at all levels has become permissible part of life causing unbearable sufferings to the people, law and order situation has deteriorated to an alarming state seriously threatening peace, tranquility, stability and life with a dignity and bickering for power among the members of the ruling party ignoring the duty to the state jeopardising national security and sovereignty

And

WHEREAS the people of the country have been plunged into a state of extreme frustration, despair and uncertainty,

And

WHEREAS in the greater national interest and also in the interest of national security it has become necessary to place our hard earned country under Martial Law and the responsibility has fallen for the same upon the Armed Forces of the country as a part of their obligation towards the people and the country,

NOW, therefore, I, Lieutenant General Hussain Mohammad Ershad, with the help and mercy of Almighty Allah and blessings of our great partriotic people, do hereby take over and assume all and full powers of the Government of the People's Republic of Bangladesh with immediate effect from Wednesday, 24th March, 1982 as Chief Martial Law Administrator of the People's Republic of Bangladesh and do hereby declare that the whole of Bangladesh shall be under Martial Law with immediate effect. Along with

Dhaka University Institutional Repository

assumption of powers of Chief Martial Law Administrator I do hereby assume the full command and control of all the Armed Forces of Bangladesh.

In exercise of all powers enabling me in this behalf, I, Lieutenant General HussainMuhammad Ershad do hereby further declare that :

a. I have assumed and entered upon the office of the Chief Martial Law Administrator with effect from Wednesday, 24th March, 1982.

b. I may nominate any person as President of the country at any time and who shall enter upon the office of the President after taking oath before the Chief Justice of Bangladesh or any judge of the Supreme Court designated by me. I may rescind or cancel such nomination from time to time and nominate another person as the President of Bangladesh. The President so nominated by me shall be the head of state and act on and in accordance with may adsvice as Chief Martial Law Administrator and perform such function as assigned to him by me. ...

... This Proclamation, Martial Law Regulations, orders and other Orders/Instructions made by me, during their continuance shall be the supreme law of the country and if any other law is inconsistent with them that other law shall to the extent of inconsistency be void.

I may by order notified in the official Gazette amend this Proclamation.

HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
LIEUTENANT GENERAL
Commander-in-Chief
Bangladesh Armed Forces
and
Chief Martial Law Administrator

Dhaka
The 24th March, 1982

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

এরশাদ সরকারের গোপনীয় পত্রাদি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গোপন নথি থেকে

সরকার সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কার্যক্রমে ভীত হয়ে পড়েছিলো শুরুতেই । তারা বুঝতে পেরেছিলো এই ঐক্য ভাঙতে না পারলে তার পতন অনিবার্য । তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তৈরি করেছিলো এক নীল নক্শা । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গোপন নথি থেকে সেই নীলনক্শার অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ক্রমশ একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে পরিণত হচ্ছে । বর্তমান সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করছে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য । আন্দোলনের এই ধারাকে এখনই বন্ধ করা এবং আন্দোলন বিরোধী কর্মসূচী প্রণয়ন করা দরকার । আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ছাত্র ঐক্য কোনো নির্দিষ্ট ইস্যু ও কর্মসূচীতে ঐক্যবদ্ধ নয় এবং তাদের মধ্যে আদর্শগত কোনো ঐক্য নেই । ছাত্র ঐক্যের কমসূচীকে মোকাবেলা করার জন্যে তাই কিছু বাস্তব কর্মসূচী দরকার । সুতরাং ছাত্রদের সরকার সমর্থকে পরিণত করবার জন্যে সরকারের তরফ থেকে সংগঠিত করা অনতিবিলম্বে খুবই প্রয়োজন । যদি এই মুহূর্তে ছাত্রদের সংগঠিত করতে কোনো টেকনিক্যাল অসুবিধা থাকে তবে, সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের উচিত কোন নেতৃস্থানীয় ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা । যাই হোক, এ ব্যাপারে কোন পাল্টা কর্মসূচী নেবার আগে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যকে বিভক্ত ও অস্থিতিশীল করার জন্যে সক্রিয় কর্মসূচী নিতে হবে ।

২। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য বিভিন্ন আদর্শ ও চিন্তার সংমিশ্রণ । ডাকসু ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠন সমন্বয়েই ঐক্য গঠিত । এই সব ছাত্র সংগঠনের ও জাতীয় রাজনীতিতে যে সব মত পার্থক্য রয়েছে, তাদের মধ্যেও আছে ।

(ক) '৭৫ পূর্ব ৭৫ উত্তর রাজনীতি (খ) বাঙালী বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ (গ) ১৫ই আগস্ট ও ৭ই নভেম্বরের মর্যাদা ও গুরুত্ব, (ঘ) আন্তর্জাতিক নীতি ও অবস্থান ।

৩। উপরোক্ত চারটি বিষয়ে এবং জয়বাংলা ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ প্রশ্নে ছাত্র সংগঠনগুলোতে মত পার্থক্য বিদ্যমান এবং তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মাত্র কিছুদিন আগেও ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো । এই সমস্ত পার্থক্যের বিষয় গুলোকে সুকৌশলে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং ছাত্রদের ঘোষণা ও সভায় সেগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যবহার করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে । এগুলো কার্যকরী করার জন্য কিছু বিশ্বাসভাজন মধ্যমানের জেলবন্দী ও জেলের বাইরের নেতাকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে খুঁজে পেতে হবে ।

৪। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ও অনৈক্য ঢুকিয়ে দিতে হবে । যেমন- বিরোধীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে অন্যপক্ষ সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে অথবা অমুক ছাত্রনেতা সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছে । কিন্তু শুধু প্রচার/প্রপাগান্ডা দ্বারা সফল হওয়া যাবে না । সুরতাং কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । যেমন কিছু ছাত্র নেতার সাথে আমাদের বৈঠক করতে হবে এবং তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে যদি আলোচনা ব্যর্থ হয় তবে তা গোপন রাখা অথবা প্রকাশ করা যেতে পারে । এসব বৈঠক / আলোচনায় রাজনৈতিক নেতা বা গ্রুপ ছাড়াও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা থাকবেন অথবা ইন্টেলিজেনস সার্ভিস-এর কর্মকর্তা থাকবেন । তাদের পরিচয় ছাত্রনেতাদের কাছে গোপন রাখা হবে । এদের বৈঠকের আগে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলা হবে ।

৫। এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন পার্টির ১০ জন বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রনেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের নাম সরকার আলোচনা করে সফলকাম হবে বলে মনে করা হয়েছিল ।

৬। উক্ত ছাত্র নেতাদের সরকারী কূটনৈতিক চাকুরি ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার লোভ দেখানো হবে । যদি প্রলোভনে কাজ না হয় তবে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মতো জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতির স্বার্থে সকল ধরনের সরকারী সহযোগিতা দেয়া হবে । এরপরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (হা-আ) এর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির কৌশল প্রয়োগ করা হবে । প্রাক্তন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ছাত্রদলের অনৈক্যকে উস্কে দেয়া হবে । যেমন একথা ছড়িয়ে দিতে হবে, ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের সহিংসতায় অধুনালুপ্ত ছাত্র সমাজকে সরকার ব্যবহার করেছিলো । এমনকি শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘাতকে ব্যবহার করতে হবে । উপরোক্ত বিষয়গুলো সুচিন্তিত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

গণ অভ্যুত্থান বুলেটিন-১
ঢাকা, ১লা ডিসেম্বর ১৯৯০
গণ অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে স্বৈর শাসনের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠছে -

১. গত ২৭ থেকে ৩০ শে নভেম্বর ও আজ ১লা ডিসেম্বর ঢাকা শহরে মগবাজার, মালিটোলা, মৌচাক, যাত্রাবাড়ী, পল্টন, শুক্রাবাদ, কলাবাগান, হাতীরপুল, মীরপুর, ডেমরা, আজিমপুরসহ অন্যান্য এলাকায় নিরস্ত্র জনতা এরশাদের সশস্ত্রবাহিনী ও অস্ত্রসজ্জিত মাস্তানদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । সারাদেশে এ পর্যন্ত এ সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন ৭৫ জনের বেশী, আহত হয়েছেন ৫ সহস্রাধিক । আজ মিরপুরে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন ৮ জন ও খুলনায় একজন ।

২. সামরিক বাহিনী, বি.ডি. আর ও তাদের ক্যাডার বাহিনী '৭১-এর মতো এখন গলিতে গলিতে ঢুকছে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করছে, নিরীহ মা-বোন ও শিশুদের অত্যাচার করছে, নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে । গত শুক্রবার গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদের সামরিক বাহিনী নির্মমভাবে পিটিয়েছে । আজ প্রেসক্লাবের সম্মুখে দেশের বরেন্য শিল্প, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে । চট্টগ্রামে ডাক্তার মিছিলে সেনা ট্রাক তুলে দেয়া হয়েছে । এসবের বিরুদ্ধে খালি হাতে ছাত্র-জনতা এখনও মিছিলে যাচ্ছে ।

৩. ঢাকা শহরসহ সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, ফেনী সর্বত্র এরশাদের খুনী বাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্রজনতা আঘাতের পর আঘাত হানছে । আন্দোলনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, কৃষি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরা পদত্যাগ করেছেন , ডাক্তাররা অবিরাম ধর্মঘট করেছেন, সাংবাদিকরা পত্রিকা বন্ধ রাখছেন, বেতার টেলিভিশনের শিল্পীরা অনুষ্ঠান বর্জন করছেন (যে অনুষ্ঠান এখন দেখানো হচ্ছে তা পূর্বে ধারনকৃত অথবা প্রচারিত অনুষ্ঠান) । সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও যুব সংগ্রাম পরিষদ, বিচার বিভাগ ও সামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে ।

৪. নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য গণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন ।

৫. প্রতিটি মহল্লা, পাড়া, গ্রামে-গঞ্জে গণ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলুন এবং বিভিন্ন প্রতিরোধ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এরশাদ বাহিনীকে প্রতিরোধ করুন ও তার সহযোগীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন সর্বক্ষেত্রে অবৈধ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করুন

৬. আপনার এলাকায় শহীদ পরিবার ও আহতদের সর্বাত্মক সাহায্য করুন । বিশেষকরে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গরীব মেহনতি মানুষকে সহযোগিতা করুন ।

৭. তিন জোটের লিয়াজো কমিটির আহ্বান অনুযায়ী সবধরনের সরকারী কার্য, সকল যানবাহন চলাচল (রিক্সা ছাড়া)বন্ধ রাখুন ও বিক্ষোভ অব্যাহত রাখুন । প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহন শ্রমিকরা অবিরাম ধর্মঘটের কর্মসূচি জানিয়েছে ।

পুলিশ বি.ডি.আর. ও সেনাবাহিনীর প্রতি

আপনারা কাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য আপনার ভাই-বোন সন্তানদের গুলি করছেন । আজ বিশ্বের সবাই জানে যে এরশাদ হচ্ছে এক নম্বর লম্পট লুটেরা ও বিশ্ব বেহায়া । তাকে সহযোগিতা না করে নিজেদেরকে জনগণের ঘৃণা থেকে রক্ষা করুন ।
বুলেটিন নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে দিন ও কপি করে বিলি করুন ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৪

খালেদা জিয়ার ভাষণ ঃ

৪ ডিসেম্বর রাতে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরদিন রেডিও এবং টেলিভিশনে থেকে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত ভাষণ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলায়কুম, আমি খালেদা জিয়া বলছি,

আপনারা আমার সগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন । দীর্ঘ নয় বছরের আন্দোলন ও শত শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমাদের বিজয় সূচিত হয়েছে । সেজন্য মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে আমি শুকরিয়া করছি সাথে সাথে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আন্দোলনের সেই বীর শহীদদের এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশবাসীকে ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা সকলের আন্দোলেনের ফলে স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়েছে কিন্তু আন্দোলনের মূল লক্ষ্য গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একটি সুখী সমাজ গড়ে তোলার কাজ আমাদের শুরু করতে হবে । এই পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর । আজ এজন্য আমাদের সকলকে হতে হবে ধৈর্যশীল ও সংযমী । ভাবাবেগে জড়িত যে কোন ধরনের উচ্ছৃংখলতা আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে । পরিণামে দেশ ও জনগণের জীবনে নেমে আসবে হতাশা । আমরা খবর পেয়েছি আন্দোলনের বিজয়ে উল্লাস ও উচ্ছ্বাসে দেশের কোন কোন জায়গায় কিছু উচ্ছৃংখল ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে । প্রতিহিংসা বা ব্যক্তি শত্রুতার কারণে প্রতিপক্ষের উপরে আক্রমণ এবং বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা হচেছ । এ ধরনের ঘটনা আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । তাই আন্দোলনের সকল নেতা, কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, আপনারা এই মুহূর্তে ভাবাবেগ সংযম করুন ও ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিন । আপনাদের কোন কাজ বা আচরণ যাতে জনজীবনের শান্তি বিনষ্ট এবং আন্দোলনের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । সকলকে মনে রাখতে হবে শান্তি সংযম ও শৃংখলাই আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে ।

খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনার ভাষণ ঃ

৪ ডিসেম্বর রাতে এরশাদের পদত্যাগ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরদিন রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত ভাষণ :

প্রিয় দেশবাসী ভাইও বোনেরা, আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন । চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত করতে বাংলা মায়ের যে সকল দামাল সন্তান নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন, আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি । তাদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি, আহতদের জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা । স্বজন হারানোর দুঃসহ বেদনা নিয়ে যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক সহমর্মিতা ।

এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিক ছাত্র-জনতার পাশাপাশি শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, রেডিও-টিভির শিল্পী কলা-কুশলী, সংস্কৃতিসেবী, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী যাঁরা রাজপথের সংগ্রামে শামিল হয়েছেন, তাদের জানাচ্ছি বিপ্লবী অভিনন্দন । গ্রেফতার হয়ে যাঁরা কারাগারে অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করেছেন তাদের জানাচ্ছি সমব্যথা ।

বাংলার কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা তথা সর্বস্তরে জনগণ স্বৈরাশাসন বিরোধী রক্তক্ষয়ী যে বীরত্বপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেছিল আজ তার বিজয়ের ধারা সূচিত হয়েছে । বীর ছাত্র-জনতার এই বিজয়ের ধারাকে যে কোন মূল্যে অব্যাহত রাখতে হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে । শত শহীদের আত্মাহুতির বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের অগ্রযাত্রাকে যাতে কোন অশুভ হাত ব্যাহত করতে না পারে তার প্রতি আন্দোলনরত সকল শক্তিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে । দেশবাসীর আশা-আকাংখার আলোকে তিন জোট কর্তৃক ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয় ও জনগণ যাতে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে চাই । আমি বিশ্বাস করি, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে দেশবাসী যেমনিভাবে চলমান আন্দোলনকে বর্তমান পর্যায়ে এনে উপনীত করেছেন, তেমনিভাবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা অতীতের ন্যায় দৃঢ় ভূমিকা পালন করবেন ।

শত শহীদের রক্তের প্রতি আমাদের এই অঙ্গীকার পালনে আমি দেশবাসীর সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা কামনা করছি ।

যে মুহূর্তে ঐকমত্য ভিত্তিক ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত প্রয়োজন । শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করতে হবে । আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না । দোষীদের অবশ্যই আইনানুগ বিচার করা হবে । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাঙালি জাতি আর কোন দিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না । রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে । বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত । শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না । ইনশাল্লাহ জনতার জয় হবেই । খোদা হাফেজ । জয় বাংলা । জয় বঙ্গবন্ধু । জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের ।